খুনে পাহাড়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা বারো

প্রকাশক :
গোপাল বল
শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ১৯৬৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : ধীরেন বল

মুদ্রাকর :
গোপাল ঘোষ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

এক

পাটা একটু হড়কাতেই পাশের গাছের একটা ডাল ধরে ফেলেছিলাম।

কিন্তু সেটা অমন পল্‌কা ভাবতে পারি নি। আর পর টান পড়া মাত্র মট্ করে ভেঙে গেল।

প্রায় খাড়া ঢাল দিয়ে তখন সোজা নিচের দিকে গড়িয়ে যেতে শুরু করেছি। দিশাহারা হয়ে হাতের সামনে যা পেলাম তাই ধরলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা একটা মোটা জংলা লতা।

লতা ছিঁড়ল না। কিন্তু রুখতেও পারল না আমার পতন। আমরই দেহের ভারে আলগা দড়ির মত পাহাড়ের গা থেকে খুলে আসতে লাগল।

তখন আর চোখ মেলে নিচে চেয়ে দেখবার দরকার নেই। পাহাড়ের এই দিকের খাড়াই কোথায় গিয়ে যে শেষ হয়েছে তা আমার ভালো করেই জানা। ওপরের পীক্ ভিউ থেকে সাবধানে ঝুঁকে বহুবার নিচের প্রায় অতল খাদের দৃশ্য দেখেছি। দেখতে গিয়ে গা-টা শিউরে উঠেছে প্রতিবারই। এটা লুকোবার জন্যে ঠাট্টার ছলে বলেছি,—হ্যাঁ ডুব-ঝাঁপ দেবার একটা জুৎ-সই জায়গা বটে, সোজা একেবারে সাড়ে তিন হাজার ফুট।

সেই সোজা সাড়ে তিন হাজার ফুট ডুব-ঝাঁপ আচম্‌কা একদিন আমাকেই দিতে হবে তখন কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম।

পারলে ওই পীক্ ভিউ-এর ধারে কাছে নিশ্চয় যেতাম না, অন্ততঃ এমন ঝড়বাদলের দিনে কখনো নয়।

মনে মনে ইষ্ট-নাম জপ না করলেও মনশ্চক্ষে নিজের পরিণামটা তখন আমি ভালো করে দেখতে পেয়েছি। মুঠোয় ধরা জংলা লতাটা খাড়াই-এর গা থেকে চড় চড় করে খুলে আসছে। সেটা যে কোথাও আটকাবে এমন কোন আশাই আর দেখছি না।

আর যদি কোথাও আট্‌কেও যায়, তাতেই বা কি লাভ হবে?

পাহাড়ের গা বেয়ে আমার গড়িয়ে পড়ার গতিবেগ ক্রমশই বাড়ছে। প্রাণপণে ধরে থাকবার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হাতের মুঠোও ক্রমশঃ অবশ আর শিথিল হয়ে আসছে উদ্বেগে আতঙ্কে। জংলা লতার পাহাড়ের গা থেকে এই খুলে পড়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে দুর্বল অসাড় আমার হাতের মুঠি সে প্রচণ্ড ঝাঁকানি কোনো রকমেই সামলাতে পারবে না।

যে রকম ভাবে লিখলাম পীক্ ভিউ থেকে সাড়ে তিন হাজার ফুট নিচে অনিবার্য গতিতে গড়িয়ে পড়তে পড়তে এরকম সুশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে ভাবনা চিন্তাগুলো অবশ্য আসে নি। কথাগুলো ওই পর্যন্ত লিখতে যতক্ষণ লেগেছে তার অনেক আগেই হাজার দেড়েক ফুট নেমে যাওয়ার মধ্যে মাথার ভেতর সব জট পাকিয়ে গিয়ে চরম আতঙ্কের একটা নিরুপায় হতাশা মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শেষ যা পরিণাম তার আর দেরী নেই, শুধু এইটুকু হুঁশই তখন আছে।

এ বিবরণটুকু যখন দিতে পারছি, তখক পীক্ ভিউ থেকে সেদিনকার পতন চরম অপঘাতে যে শেষ হয়নি একটু না বললেও বোধহয় চলবে।

পরিণামটা কি হয়েছিল তা জানাবার আগে কেমন করে এমন একটা অপ্রত্যাশিত নিদারুণ দুর্ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়লাম, সেইটেই বোধহয় বোঝানো দরকার। তা বোঝতে গেলে এ কাহিনীর আদি পর্বেই পিছিয়ে যেতে হয়।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও নাকি ধান ভানে।

প্রবাদটা যে কতখানি সত্য তা এ কয়দিনে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি।

কত আশা নিয়েই না এ জায়গাটায় এসেছিলাম। কলকাতায় কিছুদিন ধরে সব কিছু যেন জোলো লাগছিল। জোলো লাগবার আর অপরাধ কি? কয়েক বছর বাদে এইবারই কলকাতার সত্যিকার কড়া গোছের শীত পড়েছিল। দশ সেন্টিগ্রেড থেকে নয় আট এমন কি সাতও ছুঁই ছুঁই করছে ব্যারোমিটারের পারা। আর দু চারদিন এমন চললে সাত সেন্টিগ্রেডের রেকর্ডও যে ভাঙবে না তা কে বলতে পারে!

এমন মজাদার শীতের মরশুম অথচ এইবারই কলকাতায় একটা পয়লা নম্বর ক্রিকেট ম্যাচের ব্যবস্থা নেই! এম. সি. সি. আসবে আসবে করে শেষ পর্যন্ত ফরেন এক্সচেঞ্জের সমস্যায় আসতে পারছে না, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে কথাবার্তা খানিক দূর এগিয়ে কেন যে থমকে আছে, তা কর্তারাই জানেন! এদিকে আমাদের বিস্বাদ দিনগুলো কাটাতে টাক্‌না দেবার মতও কিছু জুটছে না।

দেশে সমস্যার নাকি অন্ত নেই। কিন্তু রাস্তায় ঘাটে বড়দিনের উৎসবের লোভে উপচে-পড়া ভিড়ে চলাফেরা দায়। এই অবস্থায় অত্যন্ত মনমরা হয়ে যখন দিন কাটছে, তখন মেঘ না চাইতে জলের মত আশাতীত ভাবে একটা সুযোগ মিলে গেছে।

সেদিন আর কিছু না পেয়ে দুটো অখদ্দে লোক্যাল টীমের এলে-বেলে ম্যাচ দেখে বিরক্ত হয়ে মামাবাবুর বাড়ীতে গেছলাম, পৃথিবীর অদ্বিতীয় পাচক মহাভারতখ্যাত বিরাটরাজার রন্ধনশালার 'ইন-চার্জ' স্বয়ং ভীমসেনেরই মন্ত্রশিষ্য বলে যাকে মনে হয়, সেই মঙ্‌পোর হাতের তৈরী কোনো অমৃত-ভোজ্য চা সহযোগে খেয়ে মনটাকে একটু চাঙ্গা করব বলে।

আমার মামাবাবু আর তাঁর পেয়ারের অনুচর মঙ্‌পোর কথা

অনেকেই বোধহয় অল্পবিস্তর জানেন। প্রায় অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী মঙ্‌পোকে নিয়ে মামাবাবুর বিচিত্র বিস্ময়কর সব অভিযানের কয়েকটিতে আমার নিজেরও অংশ নেবার সৌভাগ্য হয়েছে। 'কুহকের দেশ', 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস', 'মামাবাবু ফিরেছেন' ইত্যাদি লেখায় সেগুলির সাধ্যমত বিবরণ দেবার চেষ্টা আমি করেছি।

মামাবাবু শেষ কাজের জায়গা ছিল বর্মার উত্তরে মিচিনা শহর। সেখান থেকে কাজে ইস্তফা দেবার পর বেশ কিছুদিন হল কলকাতার অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন পাড়ায় তাঁর নিজের খেয়ালী চরিত্রের মত সৃষ্টিছাড়া একটি বাড়ি বানিয়ে তিনি সেখানে আছেন।

নামে বাড়ি হলেও আসলে সেটি মিউজিয়ম, লাইব্রেরী আর ল্যাবরেটরির একটি সন্নিপাত। একতলা, দোতলায় বই-কাগজ, নুড়ি-পাথর, কীটপতঙ্গ, বিরল জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি যাদুঘরের সংগ্রহে আর গবেষণাগারের সাজসরঞ্জামে মামাবাবুর নিজেরই থাকবার জায়গা যেন জোটে না। তিনি নিজে দোতালার ল্যাবরেটরির পাশে একটি ছোট কামরায় রাত্রে শোন আর মঙ্‌পো থাকে ল্যাবরেটরির অন্য পাশের একটি কুঠুরিতে।

অন্য কিছু করি না করি এ বাড়িতে প্রায় নিত্য হাজিরা না দিলে যেন ঘুমই আসে না রাত্রে। আকর্ষণটা মামাবাবুর সঙ্গসুখের শুধু নয়, মঙ্‌পো-র পাচক হিসাবে নানা কেরামতিও যে বটে তা অস্বীকার করতে পারব না! মামাবাবু ত পেটুক দূরে থাক ভোজন বিলাসী যাকে বলে তাও নন। বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধি যাঁর অত টনটনে তাঁর রসনা প্রায় যেন অসাড়। রান্নার তারতম্য বোঝবার কোন ধার তিনি ধারেন না। শিক্‌কাবাব আর সামিকাবাবের তফাৎ নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। ক্ষিদের সময়ে নেহাৎ বিস্বাদ কিছু না হলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

মঙপো-র মত রান্নার কালোয়াতের সেইটেই একমাত্র দুঃখ।

সে দুঃখ কিছুটা সে আমার জন্যে এটা সেটা তৈরি করে ভোলবার চেষ্টা করে।

মামাবাবুর বাড়িতে গেলে নতুন কিছু চাখার ব্যাপারে সাধারণতঃ হতাশ হতে হয় না। সেদিনও তা হয় নি। চা-এর সঙ্গে সঙ্গত রাখতে অনবদ্য 'ওয়েলস্ রেয়ারবিট্' খাইয়ে প্রাণ তর্ করে দিয়েছে মঙ্পো।

বদমেজাজ কেটে গিয়ে দিনটা সার্থক মনে হয়েছে 'রেয়ারবিট্'-এর স্বাদের গুণেই নয় আরো একটি কারণে।

সে কারণ হল শ্রীলোকনাথ মহান্তীর সঙ্গে দেখা, আলাপ আর তাঁর নিমন্ত্রণ।

শ্রীমহান্তী বয়সে মামাবাবুর চেয়ে অনেক ছোট। মামাবাবু যখন মিচিনা থেকে তখনকার জিওলজিক্যাল সারভের কাজ ছেড়ে আসেন, তার মাত্র কিছুকাল আগে মহান্তী সেই বিভাগেই কাজ পেয়ে মিচিনায় গেছলেন। মাত্র বছরখানেক একসঙ্গে কাজ করেছেন, কিন্তু তাইতেই বয়সের তফাৎ সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে একটা সত্যিকার প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।

মামাবাবু মিচিনা ছেড়ে আসার পর গঙ্গা আর মহানদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বর্মা আলাদা হয়েছে, দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। শ্রীমহান্তীও অনেক আগে বর্মা ও সেই সঙ্গে সরকারী কাজ ছেড়ে দেশে এসে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ শুরু করেছেন। এদেশের খনিজ সম্পদের সন্ধান ও তার নিষ্কাশন নিয়োগের ব্যবস্থা নিয়েই তাঁর কাজ।

বর্মা থেকে ফেরার পর সাক্ষাৎভাবে সব সময়ে না পারলেও মহান্তী চিঠিপত্রে মামাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এসেছেন। সম্প্রতি তিনি যে খনিজ সম্পদের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অজানা একটি অঞ্চলে কাজ করছেন, তা আগেই মামাবুর কাছ থেকে তাঁর চিঠিপত্র থেকে জেনেছিলাম। সে সব চিঠিতে তিনি বার কয়েক তাঁর নতুন

কাজের জায়গায় মামাবাবুকে একবার ঘুরে আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

এবার সে নিমন্ত্রণ জানাতে তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছেন।

মহান্তীর কাছে তাঁর নতুন কাজের জায়গার বিবরণ শুনে আমি ত তখনই নেচে উঠেছি যাবার জন্যে। মামাবাবুকেও দুবার সাধতে হয় নি।

পরের দিন বিকেলেই চেষ্টা চরিত্র করে বার্থ জোগাড় করে মহান্তীর সঙ্গে আমরা মামাভাগনে কল্পনার অরণ্য-স্বর্গে কটা স্বপ্নের দিন কাটাবার লোভে রওনা হয়েছি।

জায়গাটা কোথায় সঠিক জানাবার এখনো বাধা আছে। ধরে নেওয়া যাক অঞ্চলটার নাম লোধমা। ঘণ্টা চোদ্দ বড় লাইনের ট্রেন যাত্রার পর একটা মিটার গেজের লাইনে ঢিকি ঢিকি ঘণ্টা চারেক কাটিয়ে বাঙ্গুরকেলা বা গগনপোষ স্টেশনে নেমে মহান্তীর প্রসপেক্টিং কোম্পানী কি বনবিভাগের জীপে চড়ে গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছোট-বড় যেন সব পাহাড়ের ঢেউ, কোথাও ডিঙিয়ে কোথাও ফুঁড়ে সেখানে পৌঁছোতে হয়।

যাওয়ার ধকল আছে যথেষ্ট। কিন্তু গিয়ে একবার পৌঁছোবার পর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয়, এখানে স্বপ্নের মত বনবাসের কোনো আশাই অপূর্ণ থাকবে না। সাধ যা ছিল তা এমন কিছু আজগুবিও নয়। কলকাতার সেই শহুরে আড়ষ্ট জীবন কদিনের জন্যে একেবারে ভুলে থাকব। আশ মিটিয়ে খুশিমত ঘুরে বেড়াব এখানকার পাহাড়-জঙ্গলে। মন চাইলে একটু-আধটু হরিণ, খরগোশ বনমোরগ, তিতির ইত্যাদি শিকার করব, মাছ ধরব এখানকার অজানা সব পাহাড়ী হ্রদে, সেই সঙ্গে এখানকার সব দূর-দূরান্তরে লুকোনো অজানা পার্বত্য উপত্যকায় যুগ যুগ ধরে প্রায় বিচ্ছিন্ন ভাবে যারা কাটিয়ে এসেছে সেই সব

অধিবাসীদের অদ্ভুত বিচিত্র জীবনযাত্রার রীতিনীতি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেব—এই ছিল পরিকল্পনা।

সে কল্পনা ব্যর্থ হবার কোনো কারণও ছিল না। লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেটের কর্তা হিসাবে যতদূর দৃষ্টি যায় এই আদিম কানন-গিরিরাজ্যের ওপর মহান্তীর প্রায় অবাধ অধিকার। এই পাহাড়ে জঙ্গলের দেশে এতদিন সভ্য শিক্ষিত জগতের মানুষের পায়ের ধুলো পড়েনি বললেই হয় বহুকাল আগে বৃটিশ আমলে হেলায় ফেলায় ভাসাভাসা একটু জরিপ এ অঞ্চলের হয়েছিল। তারপর কখনো-সখনো এক আধজন ইংরেজ রাজপুরুষ নেহাৎ খেয়াল বশে এ দিকে শিকার টিকার করতে এসেছেন। সৌখীন শিকারী হয়ে এলেও সে কালের ইংরেজ রাজপুরুষদের চোখকান খোলা থাকত। তাদেরই একজন এ অঞ্চলের আদিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা নিজের দেশের কাগজে আর এখানকার সরকারী গেজেটিয়ারে প্রকাশ করেছেন, আর একজন এ অঞ্চলের পাহাড়ী মাটি লোহামেশানো বলে আগেকার সরকারী জরিপের অস্পষ্ট বিবরণে সায় দিয়েছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর এ অঞ্চলের খনিজ সম্পদ সন্ধানের উৎসাহ প্রবল হয়েছে। এখানকার পাহাড়ে মাটিতে লোহা যে আছে এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নেই। শুধু তার পরিমাণ কোথায় কত আর তা থেকে ইস্পাত তৈরির মজুরী কি রকম পোষায় তাই নতুন করে সমস্ত অঞ্চল জরিপ করে জানতে শ্রীলোকনাথ মহান্তীর কোম্পানী এখানে ঘাঁটি পেতেছে।

মহান্তীর লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেট এখানে পুরোপুরি একেশ্বর হয়ত নয়, কিন্তু আর যে দু চারটে ছোটখাট দল অন্য খুচরো ফরমাস নিয়ে আছে তারা কাগজে কলমে না হলেও আসলে লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেটের তাঁবেদার হয়ে তার ছত্রছায়ায় কাজ করে।

অঞ্চলটার নাম লোধমা বলেছি। তারই একটা ঈষৎ নেড়া

গোছের ডুংরি-র সবচেয়ে সমতল জায়গায় একটা বারোমেসে পাহাড়ী ঝরণার কাছে মহান্তীর কোম্পানীর ছাউনি। কাঠ আর ক্যাম্বিসে তৈরী হলেও সেসব তাঁবু ঘরে সুবিধার কোনো অভাব নেই বললেই হয়। মামাবাবুর সঙ্গে আমার আর মঙ্‌পোর জন্যে আলাদা দুটি লাগাও তাঁবুর ব্যবস্থা মহান্তী করে দিয়েছেন। মহান্তীর নিজের তাঁবু আমাদের কাছেই। সেটা শুধু তাঁর শোবার ঘর নয়, অফিসও তিনি সেখান থেকে চালান।

প্রথম দিন লোধ্‌মার ছাউনিতে পৌঁছোতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছল। সেদিন চারিপাশের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু ঘুরে দেখবার সময় সেদিন আর ছিল না বলে আফশোষ হয়েছে।

পরের দিন ভোর না হতেই সে আফশোষ মেটাতে বেরিয়ে পড়েছি পাখি মারা বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে।

মামাবাবু তখনও যে তাঁর ক্যাম্পখাটে কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকাচ্ছেন, তা বলাই বাহুল্য। তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছাউনির অন্য কাউকেও দেখেনি। শুধু মঙ্‌পো যে আমার আগে উঠেছে, বেরুবার মুখেই গরম চায়ের কাপ নিয়ে তাকে ঢুকতে দেখে তার প্রমাণ পেয়েছি।

অজানা জায়গা। কিন্তু পথ চেনাবার জন্যে সঙ্গে কাউকে নেওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয়নি। পথ ভুল করলেও ছাউনির ন্যাড়া পাহাড়টা চিনে আসতে পারব বলেই বিশ্বাস হয়েছে।

সন্ধ্যায় চারিধারের যে দৃশ্য দেখেছিলাম ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় তা আরো মুগ্ধ বিস্মিত করেছে। যে দিকেই চাই শুধু নিবিড় অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ের পর পাহাড়। ভাবতে ইচ্ছা করছে আদি শৈশবের তরল পৃথিবীর তরঙ্গভঙ্গ যেন কোন রোমাঞ্চিত শিহরণে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। পাহাড়ের পর পাহাড় যেন সেই হঠাৎ জমে-যাওয়া সব ঢেউ আর নিবিড় অরণ্য আবরণে সেই রোমাঞ্চের প্রকাশ।

কাঁধে বন্দুক থাকলেও পাখি মারবার চেষ্টা করিনি। মনের

আনন্দে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পাহাড় থেকে নেমে অরণ্যের পথে কিন্তু অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম।

বেলা বেশ হয়েছে বুঝে ফিরতে গিয়ে একটু মুস্কিলে পড়েছি। বনের ভেতরে কোন নির্দিষ্ট পথ ধরে ত আসিনি। খেয়াল খুশিমত চলে এসে যেখানে তখন পৌঁছেছি, সেখান থেকে আমাদের ছাউনির খাড়া পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে না।

পাহাড়টা দেখবার জন্যে একটা উঁচু জায়গায় ওঠা দরকার। কিছু দূরেই আর একটা পাহাড় দেখে তার ওপর উঠব বলে এগিয়ে গেছি। সে পাহাড়ে খানিকটা ওঠবার পর হঠাৎ চমকে থেমে যেতে হয়েছে।

নিচে থেকে কে যেন চিৎকার করে কি বলছে।

ফিরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম একজন আদিবাসীকে দেখেছি। সে খুব উত্তেজিত ভাবে হাত পা নেড়ে কি যেন আমায় উচ্চৈস্বরে বোঝবার চেষ্টা করছে।

তার ভাষা কিছুই বুঝতে না পারলেও ওপর থেকে নেমে এসেছি তার কাছে। কাছে এসেও তার কথা অবশ্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু তার আকারে ইঙ্গিতে এইটুকু বোঝা গেছে যে আমায় পাহাড়ে উঠতে সে প্রবলভাবে মানা করছে।

কিন্তু কেন?

ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে মিঃ নাগাপ্পা না এসে পড়লে তা জানতে পারতাম না। মিঃ নাগাপ্পা এখানে অন্য একটি দলের নেতা হিসাবে এসেছেন। গতকাল রাত্রে খাবার সময় মহান্তী এই নাগাপ্পা ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

মিঃ নাগাপ্পার কাছেই জেনেছি আদিবাসীদের কাছে এটা অতি পবিত্র পাহাড়। বিশেষ পরবের দিনে ছাড়া এ পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ। উঠলে সর্বনাশ নাকি অনিবার্য।

আদিবাসী পাহাড়টা সম্বন্ধে যে শব্দটা উচ্চারণ করেছে তা আমার কানে কতকটা 'এঞ্জা' গোছের শুনিয়েছে। শব্দটা যাই হোক বাংলায় তার মানেটা করালী বললে কিছুটা বোঝানো যায়। আদিবাসীদের এই পবিত্র পাহাড়ের নাম হল করালী।

মিঃ নাগাপ্পা সঙ্গে থাকায় নিজেদের আস্তানা খুঁজে ফিরতে তারপর আর কোনো অসুবিধা হয় নি। বেশ অমায়িক মিশুক লোক। এক সঙ্গে আসতে আসতে এ অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁর নানা অভিজ্ঞতার গল্প বলেছেন। তাঁর নিজেরও শিকার ও মাছ ধরার সখ আছে। এ পাহাড় জঙ্গলের দেশে কোথায় কি শিকারের সুবিধে সে বিষয়ে বেশ কিছু খোঁজ খবর ইতিমধ্যে নিয়েছেন। এসব সখের ব্যাপারে আমায় সঙ্গী পেলে খুশি হবেন জানিয়েছেন বারবার।

মিঃ নাগাপ্পা মহীশূরের লোক। একটা বড় বিদেশী কোম্পানীর হয়ে তিনিও এ অঞ্চলে প্রাথমিক এক ধরনের জরিপের কাজ করতে এসেছেন। তবে তাঁর সন্ধান লোহাটোহা নয়। এদিকে লোহার খনির কাজ শুরু হলে যে প্রচুর জলের দরকার হবে তা কোথা থেকে কি ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব তারই খোঁজ নিতে তাঁর কোম্পানী তাঁকে পাঠিয়েছে।

নাগাপ্পার সঙ্গে দলবল নেই বললেই হয়। জন তিনেক মাত্র সহকারী নিয়ে ন্যাড়া পাহাড়ের বসতিতেই একটি মাঝারি তাঁবুতে থাকেন।

এখানে আসার পর মহান্তীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী হয়েছে। খাওয়া-দাওয়াটা তাঁর মহান্তীর তাঁবুতেই হয়। সেই জন্যেই কাল রাত্রে এখানকার অন্য অনেকের আগে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল।

নাগাপ্পার সঙ্গে আস্তানায় ফিরতে সেদিন বেশ একটু বেলাই হয়ে গেছল। আমাদের ন্যাড়া ডুংরিতে আমায় উঠিয়ে দিয়ে নাগাপ্পা

নিজের কাজে চলে . গিয়েছিলেন। বাকি পথটুকু যেতে যেতে সকালের ভ্রমণ কাহিনী শুনিয়ে মামাবাবুকে তাঁর কুড়েমির জন্যে কিভাবে লজ্জা দেব তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু তাঁবুতে গিয়ে দেখি বেশ হুলস্থুল ব্যাপার! আর তার মূল হলাম আমি।

আমাকে তাঁবুতে না পেয়ে আর এতক্ষণ পর্যন্ত ফিরতে না দেখে সবাই একেবারে অস্থির। চারদিকে জন পাঁচেক লোক নাকি আমায় খুঁজতে বেরিয়ে গেছে।

সব শুনে অবাক যতটা হলাম তার চেয়ে চটলাম বেশী।

কেন, আমি কি কচি খোকা যে দুদণ্ড কোথাও একলা ছাড়া পাবার উপযুক্ত নই? সকালে একটু বেড়াতে বেরিয়েছি তাতে ভয়ে ভাবনায় দিশাহারা হবার মত সাংঘাতিক ব্যাপার কি হয়েছে! আমায় কি একলা পেলে ছেলেধরা ধরে নেবে!

কথাগুলো মামাবাবুকেই শোনাচ্ছিলাম। পাশে মহান্তীকে একটু মুখ টিপে যেন হাসতে দেখে এবার তাঁর ওপরও খাপ্পা না হয়ে পারলাম না।

মামাবাবুর কাণ্ডজ্ঞান নেই জানি। কিন্তু আপনি কি বলে ওঁর সঙ্গে তাল দিয়ে এসব পাগলামি ওঁকে করতে দিলেন? আপনি ত ওঁকে থামাতে পারতেন!

ওঁকে থামাব কি করে?—মহান্তী এবার স্পষ্টভাবেই হেসে বলেছেন,—পাগলামি যদি বলো, তাহলে উনি ত নয় সব আমিই করেছি। অস্থির হয়ে চারিদিকের পাহাড় জঙ্গলে তোমায় খুঁজতে পাঠিয়েছি আমিই।

আপনি!—সত্যিই হতভম্ব হয়ে বললাম, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি ত অনেক আশাটাশা দিয়েছিলেন এখানে আসবার আগে। এখন কি বলতে চান, আপনার এই তাঁবুর চৌহদ্দির বাইরে যাওয়াই বারণ?

এখন অন্ততঃ তাই।—আমার বিদ্রূপের খোঁচাটা যেন উপভোগ

করে বলেছেন মহান্তী,—অত সকালেই তুমি যে বেরিয়ে যাবে তা ত ভাবি নি, তাই তোমাকে সাবধান করা আর হয়ে ওঠে নি!

সাবধান! কিসের সাবধান?—বিরক্তিটা এবার বিস্মিত কৌতূহল হয়ে উঠেছে।

মহান্তীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা তারপর শুনেছি।

গতকাল আমরা শুতে যাবার পর গভীর রাত্রে দূর এক পাহাড়ী গ্রামের এক আদিবাসী একটা অত্যন্ত খারাপ খবর দিতে মহান্তীর ছাউনিতে ছুটে এসেছে।

তাদের এলাকায় হঠাৎ একটা ক্ষ্যাপা হাতীর উপদ্রব দারুণ বেড়েছে। দিন-দুপুরে কাল তাদের গাঁয়ের একজন লোককে বনের পথে শুঁড়ে জড়িয়ে পায়ে থেঁতলে মেরে ফেলেছে।

এ হাতীর ভয়ে তাদের গাঁ ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। তারা জঙ্গলের মানুষ। জঙ্গলে না বার হলে তাদের দিন চলে না। কিন্তু হাতীর ভয়ে কেউ বসতির বাইরে যেতে সাহস করছে না। ক্ষ্যাপা হাতীটা কোথায় ওত্ পেতে আছে কে জানে! তেমন মর্জি হলে তাদের নেহাত খেলাঘরের মত লতাপাতার কুঁড়ের ওপর চড়াও হতেই বা তার কতক্ষণ!

হাতীটার চালচলন সব যেন সাক্ষাৎ শয়তানের। কখন যে সে কোথায় যেতে পারে কিছুর ঠিক নেই। কিছুকাল আগে মহাবুয়াং বলে এক জায়গায় এক ক্ষ্যাপা হাতীর উপদ্রবের কথা শোনা গেছল। মহাবুয়াং কিন্তু অনেকদূরের চারচারটে বড় বড় পাহাড়ের ওপারের জঙ্গল। সেখান থেকে হঠাৎ এত দূরে ক্ষ্যাপা হাতীটা হানা দিতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারে নি। হাতীটা সম্বন্ধে আতঙ্ক তাই এত বেশী।

কাছে-দূরের সমস্ত আদিবাসী মহান্তীকে তাদের পরম সহায় বলে মানতে শিখেছে গত ক' বছরের ভেতর। ক্ষ্যাপা হাতীর কবল থেকে বাঁচবার জন্যে তাই তারা শরণ নিতে এসেছে মহান্তীর।

মহান্তীর কাছে আসবার আরো একটা কারণ তাদের আছে। যে লোকটা হাতীর উপদ্রবে মারা গেছে সে মহান্তীর ছাউনিরই একজন খিদমতগার। গাঁ থেকে ন্যাড়া পাহাড়ে মহান্তীর ছাউনিতেই আসছিল।

ক্ষ্যাপা হাতী মানেই একটা ভয়ঙ্কর কিছু। তার ওপর এ হাতীটা একটু যেন বেয়াড়া ধরনের বলে লোধমা অঞ্চলে একটু বেশী রকম সাবধান হওয়া প্রয়োজন মনে হয়েছে।

ন্যাড়া পাহাড়ের সব কটা ছাউনিতে কাল রাত্রেই খবরটা জানাবার ব্যবস্থা করেছেন মহান্তী। হাতীটা কখন কোথায় উদয় হবে তার ত কোন ঠিক নেই! তার সঠিক পাত্তা না পাওয়া পর্যন্ত তাই লোধমার ন্যাড়া পাহাড় থেকে কোথাও কাউকে যেতেই মানা করা হয়েছে।

খুব ভোরে উঠে চলে যাবার দরুন সে নিষেধ শোনবার সুযোগ আমার হয় নি। তাঁবুতে বা কাছাকাছি পাহাড়ে আমায় কোথাও সকাল থেকেই না দেখতে পেয়ে মহান্তী ও মামাবাবু ক্রমশঃ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে চারিদিকে আমার খোঁজে লোকজন পাঠিয়েছেন।

শুধু আমার জন্যেই নয়, ক্ষ্যাপা মস্তী হাতীটার সন্ধান নেবার জন্যেও পাহাড় জঙ্গলে নানাদিকে লোক পাঠান হয়েছে।

হাতীর খবর পাওয়া গেলেই মামাবাবু আর মহান্তী সেটা শিকার করতে বার হবেন এই রকম ব্যবস্থা হয়ে আছে।

হাতীর খবর তখনও অবশ্য পাওয়া যায় নি। কিন্তু পাওয়া গেলেও তখনই রওনা হতে পারবেন কি না, আমি সুস্থ শরীরে না ফেরা পর্যন্ত তাঁরা ঠিক করতে পারছিলেন না।

ছাউনির খাবার ঘরে সকালের চা জলখাবার খেতে খেতেই এসব বিবরণ শুনছিলাম।

শিকারটিকারের লোভেই কলকাতা ছেড়ে এই পাহাড়-জঙ্গলের অজানা রাজ্যে এসেছি। কিন্তু আসার পর এক রাত না কাটতে

কাটতে ভাগ্যের এতটা অনুগ্রহে একটু যেন অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

শিকার করতে চেয়েছি বলে প্রথমেই একেবারে ক্ষ্যাপা হাতী জুটিয়ে দেওয়া!

মামাবাবুর কথা জানি না, কিন্তু আমি হাতী শিকারের কথা নেহাত বইয়েই পড়েছি। শিকারের জন্যে ছোট বড় জঙ্গলে অনেকবার গেছি বটে, কেঁদো না হলেও হরিণটরিন ছাড়া চিতা কি ভালুকও একটু আধটু চোখে পড়েছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে স্বাধীন বুনো হাতী চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য কোথাও কখনো হয় নি।

এ হাতীটা আবার শুধু স্বাধীন বুনোই নয়, উপরন্তু ক্ষ্যাপা খুনে, আর শয়তানের মত চালাক।

অস্বীকার করে লাভ নেই, উত্তেজনা যতটা অনুভব করছিলাম তার চেয়ে ভয় আর উদ্বেগের কাঁপুনি খুব কম নয়।

সেদিন অন্ততঃ ভয় উদ্বেগ উত্তেজনার বাজে খরচই হল। সারা-দিনের মধ্যে কোন দিক থেকে কোন খবরই পাওয়া গেল না। ও তল্লাটে হাতীটার কোথাও কোন চিহ্নই নেই। শুধু ওই একটা মানুষের নিয়তি হয়েই যেন সে এসেছিল। তাকে শেষ করে ভোজবাজিতে গায়েব হয়ে গেছে।

পরের দিন যা খবর পাওয়া গেল তা আরো অদ্ভুত। এ অঞ্চলে নয়, ক্ষ্যাপা হাতীটাকে আবার তার পুরানো জায়গা মহাবুয়াং-এর জঙ্গলেই নাকি দেখা গেছে।

এ খবর সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করবার মত অবশ্য নয়। চার চারটে পাহাড় যে হাতী যখন খুশি পেরিয়ে যেতে পারে, হঠাৎ খেয়ালে কালই সে ফিরে আসবে না তার ঠিক কি!

ইচ্ছেমত নিজের খেয়ালে পাহাড়-জঙ্গলে ঘোরা তাই বন্ধই রইল তখনকার মত। মহাবুয়াং-এ একজন সরকারী শিকারী নাকি ক্ষ্যাপা

হাতীটার খোঁজে আছে। তার হাতে হাতীর সদগতির খবরটা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আর স্বস্তি নেই।

যে আশায় আসা তাতেই ছাই পড়ায় আমি যখন ভাগ্যের ওপর গজরাচ্চি, মামাবাবু তখন কিন্তু দিব্যি খোশমেজাজে আছেন।

মহান্তীর ছাউনিতে তাঁর নিজের কাজ চালাবার মত ছোট একটা ল্যাবরেটরী আছে। মামাবাবু দিন রাত্তির পরমানন্দে সেখানেই এমন ভাবে কাটান যে মনে হয়, কলকাতা ছেড়ে এই জন্যেই তিনি জঙ্গলের দেশে এসেছেন।

আমার কিন্তু সময় কাটানই দায় হয়ে উঠেছে। পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল নিয়ে যাদের কারবার তাদের ছাউনিতে পড়বার মত বইয়ের লাইব্রেরী আর কোথায় পাব। আর বইপত্তর থাকলেও এখানে এসে তাই পড়ে সময় কাটাতে মন চায়?

করবার আর কিছু না পেয়ে লোধমার ন্যাড়া পাহাড়টা আমি প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি।

গাছপালা অন্য সব পাহাড়ের তুলনায় একটু কম হলেও পাহাড়টা সত্যি একেবারে ন্যাড়া নয়। যে দিক থেকে ঝরনাটা বেরিয়েছে সেদিকে ত পাহাড়টা খাড়া দেয়ালের মত অনেকখানি সোজা উঠে গিয়ে রীতিমত ঘন জঙ্গলে শেষ হয়েছে।

একদিন সাহস করে বেশ দুর্গম একটা চড়াইয়ের পথ ধরে খাড়া পাহাড়ের সেই ঝাঁকড়া মাথায় গিয়ে উঠেছি। দূর-দূরান্তরে যাবার সুবিধে নেই বলে দূরবীনটা সব সময়ে কাঁধে ঝোলানোই থাকে। তাই দিয়ে দূধের সাধ খানিকটা ঘোলে মেটানো যায়।

পাহাড়ের মাথায় একটা সুবিধে মত জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরবীনটা চোখে তুললাম।

এ ক'দিন খোঁজ খবর নিয়ে কাছাকাছি চারিধারের পাহাড়গুলো অল্পবিস্তর চিনে ফেলেছি। পাহাড়ের মাথা থেকে অদিবাসীদের

পবিত্র পাহাড়ের চূড়াটা চিনতে পেরে সেদিকেই দূরবীনটা ফোকাস করলাম।

আদিবাসীরা এ পাহাড়কে পবিত্র মনে করে করালী নাম যে দিয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পাহাড়ের চূড়ার চেহারাটা সত্যিই ভয়-ভক্তি জাগাবার মত। প্রকৃতির নিজের খেয়ালে পাহাড়ের মাথার পাথরগুলো ঠিক যেন বিরাট বীভৎস একটা কুমির গোছের প্রাণীর হাঁ করা মুখ বলে মনে হয়। কটা যেন দাঁতও সে হিংস্র মুখের ভিতর থেকে উঁচিয়ে আছে।

প্রথম দিন না জেনে ওই পাহাড়ের ওপর উঠতে যাবার সময় চূড়ার এ চেহারা ঠিক দেখতে পাই নি। নিচে থেকে দেখাও যায় না ভালো করে।

প্রায় সমান উঁচু আরেক পাহাড়ের মাথা থেকে করালী পাহাড়ের যথার্থ চেহারা এই প্রথম দেখতে পেলাম।

কিন্তু পাহাড়ের গায়ের একটা সরু সুতোর মত পথে ওটা কি দেখা যাচ্ছে ?

জন্তু জানোয়ার নয়, মানুষ।

কিন্তু আদিবাসী ত নয়!

আমার দূরবীন বেশ জোরালো। তাতে যা দেখছি তা ত প্যাণ্টসার্ট-পরা সভ্য মানুষের চেহারা!

দুই

আদিবাসীদের পবিত্র পাহাড়ে সার্ট-প্যাণ্ট পরা মানুষ!

কেমন করে তা সম্ভব?

সেদিন যা অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তাতে বুঝেছি নেহাৎ নতুন বাইরের লোক না হলে এ পাহাড়ে ওঠবার কথা এ অঞ্চলে কেউ কল্পনাও করবে না।

আর বাইরের লোক কেউ এলে আমাদের এই ন্যাড়া লোধমা পাহাড়ে না এসে যাবে কোথায়? চারি ধারে অমন দু'শ মাইলের মধ্যে আদিবাসীদের কয়েকটা জংলা পাহাড়ী গ্রাম ছাড়া সার্ট-প্যাণ্ট যেখানে চলে এমন সভ্য মানুষের কোনো আস্তানা কোথাও নেই। জরীপের তাঁবু টাঁবু দূর-দূরান্তে যদি বা একটা আধটা আগে থেকে পত্তন করা হয়ে থাকে, ক্ষ্যাপা হাতীর এই বিভীষিকা শুরু হবার পর সেখান থেকে কেউ এক পাও বাড়াবে না।

ক্ষ্যাপা হাতীর ভয় আর আদিবাসীদের ধর্মের নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমাদেরই মধ্যেকার সার্ট-প্যাণ্ট পরা কে তাহলে ওই অভিশপ্ত 'এঞ্চা' অর্থাৎ করালী পাহাড়ে আজ সকালে গিয়ে উঠতে পারে?

ওঠাটা ত হাল্কা খেয়াল বলা যায় না, রীতিমত অন্যায় গোঁয়ার্তুমি।

লোধমা পাহাড়ের ক'টি ছাউনিতে যারা আছে তারা সবাই কাজের ধান্দায় এখানে এসেছে, এরকম নিরর্থক গোয়ার্তুমি তাদের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়।

করালী পাহাড়ের সরু আঁকা-বাঁকা চড়াই-এর পথটা কোথাও কোথাও কয়েকটা চূড়ার পেছনে ঢাকা পড়েছে। লোকটা এমনি একটা জায়গায় অদৃশ্য হয়ে গেছল। পাহাড়ের আড়াল থেকে

বেরিয়ে আসতেই দূরবীনটা চোখে তুলে একটু ভালো করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলাম, চেনবার মত কোন কিছু পাই কি না দেখতে।

তা অবশ্য দুরাশা। জোরালো দূরবীনেও এত দূর থেকে পোশাকটা কি রকম শুধু তাই ছাড়া মুখের চেহারার কোনো আভাসই পাওয়া যায় না। আর আভাস একটু পেলেই বিশেষ সুবিধে হ'ত কি!

এখানে এ কয়দিনে সকলকেই আমি চিনে ফেলেছি বলতে পারব না। আর, একটু আধটু দেখে থাকলেও মুখগুলো মুখস্থ নিশ্চয় আমার হয়ে যায় নি। সুতরাং মুখের চেহারার আঁচ সামান্য একটু পেলেও তা দিয়ে কাউকে সনাক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না।

কিন্তু···? মানুষটাকে ঠিকমত চেনার কোনো সুবিধে হবে না বলে দূরবীনটা নামিয়ে ফেলেছিলাম। নতুন মোচড়টা বুদ্ধিতে লাগতেই আবার দূরবীনটা ব্যাকুলভাবে চোখে তুললাম।

দেখবার সুযোগ তখন আর বেশী নেই। পাহাড়ের মাথার দিকে পথটা একটা চূড়ার আড়াল থেকে একটু উঁকি দিয়েই একেবারে অদৃশ্য হয়ে উল্টো পিঠেই বোধহয় চলে গেছে।

দূরবীনে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র মানুষটাকে দেখতে পেলাম। কিন্তু মনে হ'ল এ দেখাটা একেবারে বৃথা নাও হতে পারে।

খাড়া শিখর থেকে নেমে নিজেদের ছাউনির দিকে যেতে যেতে করালী পাহাড়ে খানিক আগে যা দেখেছি তা মামাবাবু ও মহান্তীকে তখনই জানাব কি না ভাবছিলাম।

জানান উচিত বুঝলেও সত্যি কথা বলতে গেলে এরকম একটা বাহাদুরীর সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে করেছিল না। দারুণ কিছু অবশ্য নয়, কিন্তু ব্যাপারটায় একটু রহস্যের ছোঁয়া যে আছে এ বিষয়ে ত সন্দেহ নেই। ক্ষ্যাপা হাতীর কথা শোনবার পর থেকে মামাবাবু সেই যে ল্যাবরেটরিতে সেঁধিয়েছেন আর ত' বেরুবার নাম করছেন

না। তাঁকে একটু নাড়া দেওয়া দরকার। করালী পাহাড়ে আজ যাকে চড়তে দেখেছি তার যথার্থ পরিচয় খুঁজে বার করে ব্যাপারটা নাটকীয় ভাবে সাজিয়ে মামাবাবুকে তাই একটু চমকে দিতে চাই।

এ রহস্য-ভেদের জন্যে কি করতে হবে তা তখনই প্রায় ঠিক করে ফেলেছি। ছোট বড় মিলে পাঁচটি আলাদা কোম্পানীর ঘাঁটি আছে এই লোধমা পাহাড়ে। কিন্তু লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেট বাদে অন্য কোম্পানীগুলি নেহাৎ নগণ্য। কাজের দিক দিয়ে যেমন লোকবলের দিক দিয়েও তেমনি তাদের গর্ব করবার কিছু নেই। সাধারণ শ্রমিক বাদে সব কটি কোম্পানীতে প্যাণ্ট সার্ট পরবার মত ওপরওয়ালা কর্মচারীর সংখ্যা বেশী কিছু নয়। একটু চেষ্টা করলে সাধারণ আলাপ করবার ছুতোতেই আজ সকালে কোন্ কোম্পানীর কোন্ অফিসারকে নিজের ছাউনিতে দেখা যায় নি তা জেনে নেওয়া খুব বোধহয় শক্ত হবে না।

মেঘ না চাইতেই জলের মত এ ধরনের খবর দেবার মানুষ শুধু নয়, একেবারে আসল খবরটাই নিজেদের ছাউনিতে পৌঁছোবার আগেই পেয়ে যাব তা ভাবিনি।

পাহাড়ের রাস্তায় একটা জংলা গাছের ডালে নতুন ধরনের একটা পাখী দেখে সেটা দূরবীনে ভালো করে লক্ষ্য করবার এন্যে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

ছোটবাবু!

হঠাৎ মেয়েলি নাকী-গলায় ডাকটা শুনে চমকে উঠলাম প্রথমে।

এই নির্জন জায়গায় ওই সরু নাকী গলায় 'ছোট বাবু!' বলে কে ডাকতে পারে! ব্যাপারটা ভূতুড়ে নাকি?

রহস্যটা পর মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল। যে গাছটার ডালের পাখী আমি লক্ষ্য করছিলাম তারই গুঁড়ির ওপাশ থেকে সরু

সিরিঙ্গে বকের মত চেহারার যে লোকটি কাঁচুমাচু মুখ করে বেরিয়ে এল তাকে দেখে হাসি চাপতে পারলাম না।

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, বঙ্কুবাবু আপনি এখানে! কি করছিলেন?

আজ্ঞে কিছু না।—বঙ্কুবাবু সকাতরে আমায় বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করলেন,—সত্যি এইখানে একটু নিরিবিলিতে এসে বসেছিলাম!

এবার গলা একটু গম্ভীর করতে হল,—শুধু শুধু নিরিবিলিতে এসে বসেছিলেন? এখনো ত মুখটা ভালো করে মুছতে পারেন

নি। ঠোঁটের পাশে কি খাবারের গুঁড়ো লেগে আছে! লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে এসে কি খাচ্ছিলেন?

বঙ্কুবাবু এবার একেবারে অধোবদন। ধরা পড়ে মুখে আর রা নেই।

অতি কষ্টে হাসি চেপে গলাটায় একটু ভর্ৎসনার সুর এনে বললাম,—সরকার সাহেব কি সাধে আপনাকে অত বকাঝকা করেন! আপনি ত সত্যিই···

কথাটা আমায় আর শেষ করতে হল না। সরকার সাহেবের নাম করতেই বঙ্কুবাবু একেবারে অন্য মূর্তি। ওই সিড়িংগে বক যেন আগুন ধরানো হাউই কাঠি হয়ে উঠল এক নিমেষে। একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে একটা খারাপ গালাগালই দিয়ে ফেলে বললেন,—ওই সরকার···। ওর কথা আপনারা বিশ্বাস করেন? তাত করবেন-ই। ও হল সাহেব মানুষ, গ্যাড্ ম্যাড্ করে ইংরিজি বলে, দাঁতে পাইপ চেপে তামাক খায়, আর আমি ছেঁড়া কোট প্যান্ট আর ক্যাম্বিশের জুতো পরে বিড়ি খেয়ে দিন কাটাই। আপনারা নিজের জাত ভাই-এরই ত পোঁ ধরবেন। কিন্তু ও আমায় উপোষ করিয়ে মারতে চায় তা জানেন! ও একটা ছুঁচো, ও একটা গিরগিটি, একটা গন্ধ গোকুল একটা···

বঙ্কুবাবু পশু-জগতে আরো উদাহরণ খোঁজার জন্যে একটু থামতেই গম্ভীর হয়ে সহানুভূতির স্বরে বললাম,—আপনার সব কথাই মানছি। আপনার অফিসার সরকার সাহেব একটা যাচ্ছেতাই লোক। কিন্তু, আপনার খাওয়ার লোভ একটু বেশী, ডাক্তারের মানা সত্ত্বেও আপনি লুকিয়ে চুরিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য একটু বেশী খান তা ত স্বীকার করবেন!

সহানুভূতির স্বরটুকুতেই বঙ্কুবাবু এক নিমেষে একবারে গলে জল হয়ে গেলেন। করুণ স্বরে নিজের দুর্বলতাটুকু স্বীকার করে বললেন,—তা সত্যি খাই! কিন্তু খাব নাই বা কেন বলতে পারেন?

ক'দিন আর বাঁচব! ডাক্তার যা-ই বলুক, যে কটা দিন বাঁচি আত্মা-পুরুষকে দুঃখ দিতে চাই না, বুঝেছেন ছোটবাবু!

বঙ্কুবাবুর ভোজন বিলাসের এ যুক্তির প্রতিবাদ চলে না। হেসে ফেলে তাই বললাম,—আত্মাপুরুষের দোহাই যখন দিয়েছেন তখন বুঝেছি! কিন্তু আমি হঠাৎ ছোটবাবু হলাম কি করে সেইটেই বুঝতে পারছি না।

বাঃ, আপনি ছোটবাবু হবেন না ত আর কে হবে! বঙ্কুবাবু যেন অবাক হলেন আমার বুদ্ধির স্থূলতায়, আপনি হলেন মহান্তী সাহেবের ছোট ভাই, সে হিসেবে ছোট সাহেবও অবশ্য হতে পারতেন!

না, না ছোটবাবুই ভালো!—সাহেব ঠেকাতে আমার সম্বন্ধে বঙ্কুবাবুর ভুল ধারণাটা সংশোধন না করেই কথাটা অন্য রাস্তায় ঘোরাবার জন্যে হাল্কা সুরে বললাম,—কিন্তু হঠাৎ ছোটবাবু বলে ডেকে কি লোকসানই এই মাত্র করলেন তা জানেন?

লোকসান!—বঙ্কুবাবুর মুখে বেশ একটু ভয় যেন ফুটে উঠল,—কি লোকসান করলাম?

পাখীটা উড়িয়ে দিলেন!

এবার আমার গলার গাম্ভীর্য আর বঙ্কুবাবুকে ভড়কাতে পারল না। আমার মুখের ভাবটা ঠিক মত পড়ে ফেলে তাঁর সরু নাকী গলায় বেয়াড়া সুরে হাসতে হাসতে বললেন,—ওঃ আপনি পাখী দেখছিলেন বুঝি! আমি কি তা বুঝতে পেরেছি! ওই জন্যেই বুঝি গলায় ওই দূরবীনটা ঝুলিয়ে নিয়ে ঘোরেন?

আমি একটু হেসে তাঁর অনুমানটাতেই সায় দেবার পর বঙ্কুবাবু একটু যেন চিন্তায় পড়ে যে প্রশ্নটা করলেন তা আমার পক্ষে প্রথম একটু বেয়াড়াই হয়ে দাঁড়াল।

বঙ্কুবাবু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন,—তা ওই পাহাড়ের ওপর থেকে পুব দিকে তাকিয়ে কি পাখী দেখছিলেন? ও দিকের

সব পাহাড় ত অনেক দূর! অত দূরের পাহাড়ের পাখীও দূরবানে দেখা যায়!

কি জবাব এখন দেওয়া যায় বঙ্কুবাবুকে, ভাবতে গিয়ে বেশ একটু ফাঁপরেই পড়লাম। বঙ্কুবাবু এখানে লুকিয়ে বসে ছাউনির ক্যান্টিন থেকে চুরি করে আনা মিষিদ্ধ খাবার খেতে খেতে আমায় ভালো করেই লক্ষ্য করেছেন বোঝা গেল। 'এমনি পাহাড় দেখছিলাম।' বললে একটু সন্দেহের খোঁচা ওঠবারই সুতরাং সুবিধে দেওয়া হবে। দুবার তিনবার চোখে দূরবীন তুলে অমন তন্ময় হয়ে ঠিক এক দিকেই লক্ষ্য রাখাকে ঠিক উদ্দেশ্যহীন এমনি দেখা বলে চালান যায় না! অতদূরে পাহাড়ে কোনো পাখী দেখছিলাম বললে আমার দূরবীনের শক্তিটা একটু আজগুবি রকম বাড়াতে হয়। বঙ্কুবাবু দূরবীন সম্বন্ধে অজ্ঞ আনাড়ি হলেও এ মিথ্যেটা হয়ত ধরে ফেলতে পারেন।

সরল সত্য কথাটা তাঁকে জানালেই অবশ্য সব সমস্যা চুকে যায়। কিন্তু তাহলে আমার গোয়েন্দাগিরির প্ল্যান গোড়াতেই একটু ভেস্তে যায় যে! মামাবাবু বা মহান্তীর কাছে নাটকীয়ভাবে রহস্যভেদের মজাটা তাহলে আর হয় না।

এতগুলো ভাবনা এক নিমেষেই মাথার মধ্যে পাক খায় নি। বঙ্কুবাবুর বেয়াড়া প্রশ্নটার উত্তর ভাববার সময় নেবার জন্যেই একটু থেমে এ ধরনের অবস্থায় সবাই যা করে সেই মত প্রশ্নটাকেই প্রথম আবার আউড়ে বলেছি,—অতদূরে পাখী দেখা যায় কি না জিজ্ঞাসা করছেন? কিন্তু পাখী ত আমি দেখছিলাম না!

উত্তরটা এই পর্যন্ত দিতে না দিতেই বঙ্কুবাবুর বেয়াড়া প্রশ্নটা থেকে নিজের সমস্যার সমাধানের সুবিধে করে নেবার কথাটা মাথায় এসে গেল।

কি দেখছিলেন তাহলে?—এ প্রশ্নে বঙ্কুবাবুকে আর করবার সময় না দিয়ে সত্যটা অর্ধেক গোপন করে বললাম,—দেখছিলাম,

ওই 'এঞ্জা' না কি বলে, আদিবাসীদের সেই পবিত্র পাহাড়ের চূড়োটা। ভাবছি, আজ একবার পাহাড়টায় যাব।

যা আঁচ করেছিলাম ঠিক সেই ফলই ফলল। বঙ্কুবাবু একেবারে আঁৎকে উঠে বললেন,—ও পাহাড়ে যাবেন কি মশাই, ও পাহাড়ে ওঠাই মানা। তাছাড়া এখন ত কোথাও যাবার কথাই ওঠে না। মহাবুয়াং-এর ক্ষ্যাপা হাতীর কথা ভুলে যাচ্ছেন? লোধমা পাহাড় ছেড়ে কারুর যাবার হুকুমই নেই!

সবাই সে হুকুম মেনে চলছে বলতে চান?—বঙ্কুবাবুকে যেন হাল্কাভাবেই প্রশ্নটা করলাম।

বঙ্কুবাবু কিন্তু আমার দিকে প্রথম একটু অবাক হয়ে চেয়ে তারপর যেন আক্রোশটা চাপতে না পেরে বলে ফেললেন,—মানছে না শুধু একজন। ওই সরকার সাহেব!

তিন

নিজেদের ছাউনিতে ফেরার পর বঙ্কুবাবুর কথাটাই সবিস্ময়ে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করছিলাম।

মামাবাবু আর মহান্তীকে ব্যাপারটা তখন জানানো হয় নি। সুযোগই ছিল না জানাবার। মহান্তী তাঁর অফিস ঘরে ওখানকার অন্য সব কোম্পানীর কয়েকজন মাথার সঙ্গে একটা জরুরী পরামর্শ সভায় বসেছেন, আর মামাবাবু তাঁর ল্যাবরেটরিতে ঢুকে একেবারে কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছেন তাঁকে কোনরকমে বিরক্ত না করবার।

আমাদের ছাউনির খাস বেয়ারা রামস্বরূপের কাছে এসব খবর পেয়ে স্নানটা সেরে নেবার জন্যে বাথরুমে ঢুকেই কথাটা ভাবছিলাম।

বঙ্কুবাবু আক্রোশের বশে যে কথাটা চাপতে পারেন নি তার মানেটা তলিয়ে দেখতে গেলে বেশ একটু গোলমালে পড়তে হয়।

সবাই যা মেনে চলছে একমাত্র সরকার সাহেবই তা অগ্রাহ্য করে খুশিমত যেখানে সেখানে যান। ক্ষ্যাপা হাতীর ভয় তাঁকে ঠেকিয়ে রাখে না, আদিবাসীদের পবিত্র পাহাড়ের ধর্মের মানাও নয়।

সকালে করালী পাহাড়ে শার্ট-প্যান্ট পরা যে মূর্তি দূরবীনে দেখেছি তা যে সরকার সাহেবের, বঙ্কুবাবু নাম না করেও স্পষ্টই তা জানিয়ে দিয়েছেন। সরকার সাহেবের এ অদ্ভুত কাজটা কি ধরনের খেয়াল বা গোঁয়ার্তুমি? নিছক খেয়াল বা গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কি গরজ থাকতে পারে এরকম বেয়াড়া আচরণের?

সরকার সাহেবের সঙ্গে এ কয়দিনে সামান্য একটু চেনাশোনা

হয়েছে মাত্র। বিশেষ কিছুই তাঁর সম্বন্ধে জানি না। লোধমা পাহাড়ে যে কটি কোম্পানী এসে খুঁটি গেড়েছে তার মধ্যে সরকার সাহেবের কোম্পানীই সবচেয়ে নগণ্য সন্দেহ নেই। কোম্পানী বলতে তিনি, বঙ্কুবাবু আর একজন ফাইফরমাস খাটার এদেশী আদিবাসী বেয়ারা।

কোম্পানীর নামটা একটু জমকালো গোছের, আই. ডব্লিউ. এস. —অর্থাৎ ইণ্টারন্যাশন্যাল ওয়াটার সাপ্লায়ার্স। কাজটা আসলে এই—নতুন কোথাও কারখানা কি খনিটনির জন্যে বসতি গড়ে ওঠার ব্যবস্থা হলে সেখানে জল সরবরাহের কলটল বসাবার অর্ডার যোগাড় করা। এ উমেদারী যাতে সার্থক হয়, তার জন্যে আগে আগে থেকে একটু আধটু লোক দেখানো জরিপও চালাতে হয়। লোধমা পাহাড়ের অঞ্চলে জল পাবার সুযোগ কোথায় কোথায় আছে তাই খোঁজবার নামে সরকার সাহেব তাঁর কোম্পানীর হয়ে এখানে একটা ঘাঁটি খুলেছেন।

কাজ কতদূর কি করছেন জানি না, তবে পোশাক-আশাকে আর চালচলনে সত্যিই বঙ্কুবাবু যা বলেছেন তাই—দাঁতে পাইপ চাপা, গ্যাডম্যাড করে ইংরাজী বলা পাক্কা সাহেব।

এই সাহেবী ভড়ং-এর জন্যে তাঁকে গোড়াতেই একটু লক্ষ্য করেছি। বিশেষ করে বঙ্কুবাবুর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের জন্যে নজরটা একটু বেশী পড়েছে।

বঙ্কুবাবু একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের বোকা-সোকা মানুষ সন্দেহ নেই। সিড়িঙ্গে বকের মত চেহারা আর সরু মেয়েলি গলার জন্য তাঁকে আরো হাস্যাস্পদ লাগে। এখানকার সবাই অল্পবিস্তর তাঁর পেছনে লাগে মজা করবার জন্যে। বিশেষ করে বঙ্কুবাবুর পেটুক-পনাটা লোধমা পাহাড়ের সব ছাউনিতেই একটা নিত্যকার তামাসার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর সবাই বঙ্কুবাবুকে নাচিয়ে একটু নির্দোষ হাসি তামাসাই

করে, কিন্তু সরকারসাহেব যা করেন তা আমার অন্ততঃ বেশ একটু নিষ্ঠুরই মনে হয়েছে।

জরিপের কাজে সরকার সাহেব বেশীর ভাগ বঙ্কুবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। শুনলাম, বঙ্কুবাবুর কাছে যা সবচেয়ে কষ্টকর জরিপের টহলে বেরিয়ে সরকার সাহেব তাঁকে সেই শাস্তি দিয়ে মজা করেন। ডাক্তারের বারণ বলে বঙ্কুবাবুকে প্রায় উপোস করিয়ে রেখে তাঁকে দিয়েই বওয়ানো টিফিন কেরিয়ার তাঁর সামনে খুলে সরকার সাহেব দেখিয়ে দেখিয়ে তার উপাদেয় 'লাঞ্চ' খান।

আমরা আসার পর থেকেই ক্ষ্যাপা হাতীর ভয়ে জরিপ-টরিপ সব বন্ধ। নিজে তাই চাক্ষুস দেখিনি, বঙ্কুবাবুর এ শাস্তির গল্প রসাল করে সরকার সাহেবই শুনিয়েছেন। নিজের চোখে বঙ্কু-বাবুকে নিয়ে সরকার সাহেবের তামাসার যে নমুনা দেখেছি তাও আমার খুব ভালো লাগেনি।

বঙ্কুবাবু যে এই ন্যাড়া পাহাড়ের নীরস কাজসর্বস্ব জীবনে হাসির খোরাক যোগান তা দু-একদিন এখানে থেকেই বুঝে নিয়েছিলাম। যাঁরা তাঁকে নিয়ে মজা করেন তাঁদেরও খুব দোষ নিই নি। বঙ্কু-বাবুর নিজের দোষও আছে। তাঁর নিজের বোকামিতে সবাইকে, এমন কি বেয়ারা চাপরাসিদেরও বঙ্কুবাবু তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করবার সুযোগ দেন।

কদিন আগে বিকেলে ক্ষ্যাপা হাতীর ব্যাপারটা আলোচনার জন্যেই লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেটের ছাউনিতে একটা চায়ের আসর বসেছিল। এক নাগাপ্পা বাদে সব কোম্পানীর বড় কর্তারাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহান্তীর অতিথি হিসেবে মামাবাবুর সঙ্গে আমিও থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

ক্ষ্যাপা হাতীর সমস্যা সমাধানের কোনো মোক্ষম উপায় কেউ বাৎলাতে পারে নি। হাতীর দৌরাত্ম্যে সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে

থাকায় কি ক্ষতি যে হচ্ছে সেই আলোচনাই হয়েছিল বেশী। খনির কাজ সরকারী ভাবে শুরু করার জন্যে তার যন্ত্রপাতি যোগাবার ভার যে কোম্পানী পেয়েছে সেই এম এম অর্থাৎ 'মাইনিং মেশিনারিজ'-এর প্রতিনিধি মিঃ মানুচিই সব চেয়ে সুপরামর্শ দিয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছে। ক্ষ্যাপা হাতী মারবার জন্যে যা ব্যবস্থা হয়েছে তা যথেষ্ট নয় বলে তাঁর ধারণা। তা ছাড়া ক্ষ্যাপা হাতী সম্বন্ধে ভয়টাও তাঁর মতে একটু মাত্রা ছাড়ানো। হাতীটা মহাবুয়াং থেকে আশ্চর্যভাবে হানা দিয়ে এদিকের পাহাড়ে একজন মানুষ মেরেছে ঠিকই। কিন্তু ওই এক জনকে মারবার পর এ অঞ্চলে তার মারাত্মক উপদ্রবের আর কোনো খবর পাওয়া গেছে কি? পাগলামির খেয়ালে একবার এদিকে এসে পড়লেও সে এ তল্লাট একেবারে ছেড়ে গেছে এমনও ত হতে পারে। আর সম্পূর্ণ ছেড়ে যাক বা না যাক নতুন কোনো উপদ্রব যখন এ পর্যন্ত করে নি, তখন লোধমা এলাকায় সকলের ওপর একেবারে ঘরে বন্ধ থাকার হুকুম একটু আলগা করা যেতে পারে। ক্ষ্যাপা হাতীর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে নয়, তার সম্বন্ধে সাবধান থেকে কাজকর্ম আবার শুরু করা উচিত, এই হল মানুচির মত। যে পাহাড়ী রাস্তায় মহান্তীর কোম্পানীর আদিবাসী আরদালিকে হাতীটা মেরেছে, সে জায়গাটা থেকেও একটা সন্ধান চালাবার প্রয়োজনের কথা তুলেছেন মানুচি। ঠিক মত সন্ধান নিতে পারলে হাতীটা ওই অঞ্চলে কোথা দিয়ে এসেছে ও কোন্ দিকে গেছে বোঝা অসম্ভব হবে না বলে মানুচির ধারণা।

মানুচি হয়ত তাঁর মতের স্বপক্ষে আরো কিছু যুক্তি খাড়া করতেন, কিন্তু সেই সময়ে আমাদের সভা ঘরের দরজায় বঙ্কুবাবুকে একবার উঁকি দিতে দেখা গেছে। আর তাঁকে দেখেই সরকার সাহেব মজা করবার উৎসাহ আর চাপতে পারেন নি। চোখ মুখ পাকিয়ে কড়া গলায় ধমক দিয়ে ডেকেছেন,—বঙ্কুবিহারী!

ধমক শুনেই বঙ্কুবাবুর অবস্থা কাহিল। ভয়ে ভয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছেন কাঠগড়ার আসামীর মত।

কি করতে এখানে এসেছ? বজ্রস্বরে জানতে চেয়েছেন সরকার সাহেব।

মনে পাপ থাকার দরুন কি না বলা শক্ত, বঙ্কুবাবু এ জেরায় একেবারে থতমত। ভয়ের চোটেই আরো সরু হয়ে-যাওয়া গলায় দু চারবার আজ্ঞে—আজ্ঞে বলে একেবারে বোবা হয়ে গেছেন।

এখানে আমাদের চায়ের আসর বসেছে।—সরকার সাহেব যেন হুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে বলেছেন,—ভালো মন্দ কিছু না কিছু খাবার আয়োজন হয়েছেই নিশ্চয় ক্যান্টিন থেকে। তারই লোভে ছোঁক ছোঁক করে ঠিক এসে হাজির হয়েছ বেহায়ার মত, কেমন? বলো সেই লোভে লোভে এসেছ কি না?

বঙ্কুবাবু করুণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়েছেন। তার পর তাঁর প্রাণের দুঃখ বোঝবার কেউ নেই মনে করে নিরুপায় হয়ে স্বীকার করেছেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাঁর সে মিহি মেয়েলি গলার করুণ স্বীকারোক্তি শুনে আর সকলের সঙ্গে না হেসে উঠে পারি নি।

সরকার সাহেব শুধু এই স্বীকারটুকু করিয়েই ছাড়েন নি। মজাটা আরো একটু টেনে নিয়ে গিয়ে ক্যান্টিনের হেড রাঁধিয়ে ছোটলালকে ডেকে বলে দিয়েছেন—বঙ্কুবিহারীকে চা জলখাবার আমাদের যা দিয়েছ সব দাও প্লেট ভর্তি করে।

এ আশাতীত অনুগ্রহে বঙ্কুবাবুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠতে না উঠতে সরকার সাহেব তাঁর শেষ হুকুম ছেড়েছেন,—বঙ্কুবিহারীর রাতের খাওয়া কিন্তু আজ বন্ধ মনে রেখো।

বঙ্কুবাবু ছটফটিয়ে উঠে মিহি নাকী সুরে বৃথাই তাঁর প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করেছেন।

সকলের সঙ্গে তামাসাটা উপভোগ করছি ঠিকই, কিন্তু বেশ

একটু খারাপও লেগেছে। সরকার সাহেবের তামাসাটা ঠিক নির্দোষ যেন নয়। তার মধ্যে যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে।

এ তামাসার পর সেদিনকার আলোচনা সভা অবশ্য ভেঙে গিয়েছিল।

বঙ্কুবাবুকে নিয়ে সরকার সাহেবের একটু নিষ্ঠুর মজা করার ধরনটা তারপর কয়েকবার চোখে পড়েছে। সরকার সাহেব মানুষটাকে তাতে খুব প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারি নি। বঙ্কুবাবুর কাছে নতুন খবরটা পাবার পর বিরূপতার সঙ্গে মনের মধ্যে একটু বিমূঢ়তাও মিশেছে এখন।

বিমূঢ়তাটা অবশ্য নিরর্থক হতে পারে। সরকার সাহেব মানুষটার মধ্যে দয়ামায়ার হয়ত একটু অভাব আছে, সেই সঙ্গে লুকিয়ে নিয়ম ভাঙার একটা বেয়াড়াপনা, যেটা আসলে খামখেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।

এই ব্যাখ্যাটা সঠিক হোক বা না হোক সরকার সাহেবের ওপর এখন থেকে গোপনে একটু নজর রাখবার সঙ্কল্প নিয়েই স্নান সেরে বার হলাম।

মহান্তীর কনফারেন্স তখন শেষ হয়েছে। মামাবাবুই শুধু ল্যাবরেটরি থেকে বার হন নি।

নিজে থেকে না বেরিয়ে এলে তাঁকে ডাকার হুকুমও নেই বলে তাঁকে বাদ দিয়েই মহান্তীর সঙ্গে খাবার টেবিলে গিয়ে বসতে হল।

মামাবাবু কদিন ধরে যে রকম নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন তাতে মনের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভ জমে ছিল। একটু ঝাঁঝের সঙ্গে তাই জিজ্ঞাসা করলাম, মহান্তীকে,—আপনার এই ক্যাম্পিসের ল্যাবরেটরিতে কি এমন যুগান্তকারী গবেষণা মামাবাবু করেছেন বলুন ত।

আমি-ই কি জানি যে বলব ? মহান্তী গম্ভীর হয়ে বললেন,—দেখছ না ল্যাবরেটরিতে আমারও প্রবেশ নিষেধ।

বাঃ চমৎকার ব্যাপার ত!—আমি অবাক হয়েই বললাম,—আপনার ল্যাবরেটরিতে কি গবেষণা হচ্ছে, আপনিই জানেন না! ঢোকাও আপনার বারণ!

সত্যিই কি আর বারণ! এবার মহান্তী হেসে ফেললেন,—তবে ডাঃ সেনকে ত আজ নতুন দেখছি না। কোনো কিছুর মধ্যে যখন এই রকম ডুবে থাকেন, তখন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যান। নিজে থেকে না ডাকলে সে সময়ে ওঁর কাছে যাওয়া উচিত মনে করি না।

মহান্তী যা বললেন, তা কি আমার অজানা? কিন্তু এই পাণ্ডব বর্জিত জংলা পাহাড়ের ছেলেখেলার এই ল্যাবরেটরিতে ডুবে যাবার মত হঠাৎ এমন কি পেলেন মামাবাবু? সবাই যখন ক্ষ্যাপা হাতীর সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তখন মামাবাবু কি ল্যাবরেটরিতে তার মুস্কিল আসান খুঁজতে ঢুকেছেন।

ঠিক ওই ভাষায় না হলেও পরিহাসের সুরে মহান্তীকে যা প্রশ্ন করলাম, তার মধ্যে ওই ক্ষোভটা একেবারে প্রচ্ছন্ন রহিল না।

বললাম,—মামাবাবু কি ল্যাবরেটরিতে বসেই ক্ষ্যাপা হাতী তাড়াচ্ছেন নাকি?

উত্তরটা আর পাওয়া গেল না।

মহান্তীর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন ফিরে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

মামাবাবু ল্যাবরেটরির জন্যে বরাদ্দ তাঁবুঘর থেকে বেরিয়ে ছাউনির বাইরের দিকে চলে যাচ্ছেন।

মামাবাবু একা নয়, তাঁর সঙ্গে আর একজন আছেন। মামাবাবুকে দেখে নয়, হতভম্ব হয়েছি মামাবাবুর সেই সঙ্গীটিকে দেখে।

সঙ্গীটি আর কেউ নয়, সরকার সাহেব। মামাবাবু তাঁর সঙ্গেই নিচু গলায় কি যেন আলাপ করতে করতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

সরকার সাহেবের মামাবাবুর সঙ্গে থাকা ত আশ্চর্য ব্যাপার! তিনি কি মামাবাবুর ল্যাবরেটরিতেই ছিলেন?

উত্তেজিতভাবে সেই প্রশ্নই করলাম মহান্তীকে। মহান্তী সায় দেওয়ায় অবাক হয়ে বললাম,—তবে যে আপনি বললেন, উনি কাজে ডুবে আছেন। নিজে থেকে না ডাকলে আপনি পর্যন্ত কাছে যাওয়া উচিত মনে করেন না!

তা ত করি-ই না।—মহান্তীর চোখে একটু বুঝি কৌতুকের ঝিলিক দেখা গেল,—কিন্তু নিজে থেকে যাকে ডাকেন, তার যাওয়ায় ত দোষ নেই?

তার মানে? আরো বিমূঢ় হয়ে বললাম,—মামাবাবু গবেষণা নিয়ে তন্ময় হওয়ার মধ্যে ওই সরকার সাহেবকে নিজে থেকে ডেকেছেন? কেন?

গবেষণার ব্যাপারেই নিশ্চয়।—সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন মহান্তী।

গবেষণার ব্যাপারে আপনি থাকতে সরকার সাহেবকে?—আমি ঝাঁঝালো গলাতেই বললাম, উনি কি আপনার চেয়ে বড় খনিজবিশেষজ্ঞ?

তা হওয়া অসম্ভব কিছু'ত নয়।—মহান্তী যেন একটু দুঃখের হাসি হাসলেন,—ডাঃ সেন নইলে ওঁকেই ডেকেছেন কেন?

কয়েক সেকেণ্ড গুম হয়ে বসে থেকে সবচেয়ে জরুরী প্রশ্নটা করলাম,—সরকার সাহেব কখন থেকে ল্যাবরেটরিতে আছেন, জানেন?

তা জানি বইকি।—মহান্তী হেসে বললেন,—সেই সকাল থেকেই আছেন!

সকাল থেকেই! সকাল থেকেই!—মহান্তীকে বেশ একটু অবাক করে বিস্ময়টা সরবে প্রকাশ করেই ফেললাম।

কি হল কি?—জিজ্ঞাসা করলেন মহান্তী।—সরকার সাহেবের সকাল থেকে ল্যাবরেটরিতে থাকাটায়। আশ্চর্য হবার কি আছে?

চার

কি যে আছে তা মহান্তীকে তখন বলতে পারি নি

জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেইদিনই বিকেলে বঙ্কুবাবুকে একটু নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে,—আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন ?

থতমত খেয়ে বঙ্কুবাবু কাঁদ কাঁদ গলায় বলেছিলেন,—মিথ্যে কথা। কই ? কি বলেছি ?

এরপর বঙ্কুবাবুকে বেশ একটু কড়া করেই ধমক দিয়েছিলাম।

—কি মিথ্যে বলেছেন জানেন না! সকালে কি বলেছিলেন আমায় ?

ভান কিনা জানি না, কিন্তু বঙ্কুবাবু বেশ যেন একটু তড়কে গিয়ে সকালের কথা ভাবতে চেষ্টা করছেন মনে হয়েছিল।

অনেক ভেবেচিন্তে কাতরভাবে যা জানিয়েছিলেন তাতে হাসি পাবারই কথা। তবে মেজাজটা তখন রীতিমত খারাপ ছিল বলে কৌতুকের বদলে বিরক্তিই বোধ করেছিলাম।

বঙ্কুবাবু আমার অভিযোগ কাটাবার জন্যে করুণভাবে বলেছিলেন,—আজ্ঞে সকালে গোড়ায় একটু লজ্জা হয়েছিল। তারপর সত্যি কথা ত স্বীকার করেছিলাম। কেন অমন করে লুকিয়ে খাই তাও বলে ছিলাম আপনাকে।

আপনার চুরি করে খাওয়ার কথা হচ্ছে না!—রুক্ষ স্বরে বলেছিলাম,—রাতদিন আপনার শুধু খাওয়ার চিন্তা বলে ওই কথাই ভাবছেন। আর কি তখন বলেছিলেন মনে পড়ছে না ? কি বলেছিলেন সরকার সাহেবের সম্বন্ধে ?

সরকার সাহেবের সম্বন্ধে!—বঙ্কুবাবু এবার কিন্তু আর থতমত

খান নি। আমায় অবাক করে দিয়ে বেশ একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই বলেছিলেন,—সরকার সাহেব সম্বন্ধে মিথ্যে ত কিছু বলি নি।

মিথ্যে বলেন নি!—আমি মেজাজটা কড়াই রেখেছি,—বলেছিলেন না যে, সরকার সাহেব আজ সকালে আদিবাসীদের এঞ্চা পাহাড়ে গেছেন!

এবার আমারই প্রথমে হতভম্ব তারপর অপ্রস্তুত হবার পালা। কাঁদুনে মিহি গলায় হলেও বঙ্কুবাবু রীতিমত ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছিলেন,—আজ্ঞে, সে-রকম কোন কথাই ত বলি নি। আমি শুধু বলেছিলাম, লোধমা পাহাড় ছেড়ে কোথাও যাওয়া বারণ হলেও সরকার সাহেব তা মানেন না। মনে করে দেখুন, আজকের সকালে যাওয়ার কথা, কি এঞ্চা পাহাড়ের নাম উচ্চারণও করি নি।

সকালের কথাগুলো ভালো করে স্মরণ করে মনে মনে বেশ লজ্জিত হয়েছিলাম। সত্যিই সরকার সাহেব সেদিন সকালেই এঞ্চা পাহাড়ে গেছেন এমন কোনো কথা ত বঙ্কুবাবু বলেন নি! লোধমা পাহাড় ছেড়ে যাবার নিষেধ একমাত্র সরকার সাহেবই মানেন না শুনে আমি খবরটার নিজের মত মানে করে নিয়ে আমার মনগড়া সন্দেহগুলো সরকার সাহেবের ওপর চাপিয়ে বসে আছি।

ভেতরে ভেতরে যে লজ্জা পেয়েছিলাম বাইরে তা প্রকাশ করি নি অবশ্য। তার বদলে সে লজ্জা ঢাকতে বেশ গলা চড়িয়ে অভিযোগটা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আজকের সকালে এঞ্চা পাহাড়ের নাম না হয় করেন নি, কিন্তু সরকার সাহেব সম্বন্ধে যা বলেছেন তা-ই ত মিথ্যে। শুধু আপনার আক্রোশ মেটাতে ও কথা ত বানিয়ে বলেছেন!

আক্রোশ মেটাতে বানিয়ে বলেছি!—বঙ্কুবাবু একেবারে যেন মিহি গলায় ডুকরে উঠেছিলেন,—বেশ, আজ হোক কাল হোক আমি আপনাকে নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখাব।

কি, দেখাবেন কি? সরকার সাহেব লোধমা পাহাড় ছেড়ে বাইরে যান, এই?—গলাটা কড়া রেখেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

শুধু তাই কেন। আরো কিছু!—বঙ্কুবাবু এবার গলায় হঠাৎ রহস্যের ছোঁয়া লাগিয়ে বলেছিলেন,—চুপি চুপি ডাকব কিন্তু। কাউকে কিছু জানাবেন না। চুপি চুপি ডাকলে আসবেন ত?

বঙ্কুবাবুর ভঙ্গি দেখে এবার না হেসে পারি নি। চুপি চুপি বা চেঁচিয়ে যেমন করেই ডাকুন আসব—বলে কথা দিয়ে তাঁকে ছেড়ে এসেছিলাম!

বঙ্কুবাবুর সঙ্গে আলাপটা হাল্কাভাবেই শেষ করে এসেছিলাম বটে, কিন্তু মনের ভেতর সংশয় সন্দেহের অস্বস্তিটা আরো বেড়েই গেল তারপর। হেঁয়ালিটা আরো ত গভীর হয়েই উঠেছে ক্রমে ক্রমে।

বঙ্কুবাবুর কথা আমি না হয় ভুল বুঝেছি, কিন্তু সেদিন সকালে বারণ থাকা সত্ত্বেও কেউ যে লোধমা পাহাড় থেকে বেরিয়ে এঞ্চা পাহাড়ে উঠেছিল এ বিষয়ে ত সন্দেহ নেই।

সে কে হতে পারে তা ত নতুন করে সন্ধান নিতে হয়। অমন করে সব নিষেধ অগ্রাহ্য করেও পাহাড়ে সাত সকালে ওঠবার গরজই বা কার এবং কেন?

সরকার সাহেব সম্বন্ধে সেদিনকার সন্দেহটা অমূলক বলে প্রমাণ পাওয়া গেলেও তাঁর বিষয়ে মনের মধ্যে একটু খোঁচা যেন থেকে যায়। বঙ্কুবাবু শুধু আক্রোশের বশে তাঁর সম্বন্ধে তাহা মিথ্যে কথা বলেছেন বলে ত মনে হয় না। সরকার সাহেব চেহারা-চাল-চলনেই কেমন যেন একটু বেয়াড়া গোছের মানুষ। নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তিনি এ ক'দিনের মধ্যে লোধমা পাহাড় থেকে কখনো কখনো যে বেরিয়ে গেছেন বঙ্কুবাবুর এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ভাবা যায় কি?

সমস্ত ব্যাপারটা এক হিসেবে এমন কিছু মাথা ঘামাবার হয়ত নয়। একটা খুনে ক্ষ্যাপা হাতীর ভয়ে কিছুদিনের জন্যে এ অঞ্চলে

খুশিমত ঘোরাফেরা বারণ করা হয়েছে, আর তা সত্ত্বেও দু একজন সে বারণ অগ্রাহ্য করছে, আসলে এই ত ব্যাপার। এর সঙ্গে আদিবাসীদের পবিত্র এঞ্চা পাহাড়ে ওঠার ঘটনাটা ধরলেও তেমন কিছু রহস্য সব কিছুকে জড়িয়ে আছে ভাবাই হয়ত আমার কল্পনাবিলাস।

মনকে এইভাবে বোঝাবার চেষ্টা যে করি নি তা নয়, কিন্তু খুব সফল হয়েছি বলতে পারব না। ওপর থেকে তেমন কিছু বোঝা না গেলেও কি যেন একটা অস্বাভাবিক অশুভ কিছু সব কটা ঘটনাকে জড়িয়ে আছে বলে সন্দেহটা মন থেকে দূর হতে চায় নি।

আমার সন্দেহ যে একেবারে কাল্পনিক নয় পরের দিনই তার অমন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে তা অবশ্য ভাবতে পারি না।

প্রমাণটার কথা জানা গেল আবার স্বয়ং মামাবাবুর কাছ থেকে।

আগের দিন মামাবাবুকে একবারও সুবিধে মত ধরতে পারি নি। দুপুর পর্যন্ত তিনি ত সরকার সাহেবের সঙ্গে ল্যাবরেটরিতেই কাটিয়েছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে খাবার ঘরে আসবেন জেনে সেখানে অপেক্ষা করাও বৃথা হয়েছে। আমাদের খাওয়া শেষ হবার পর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও মামাবাবুকে আসতে না দেখে মহান্তীই রামস্বরূপকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন। রামস্বরূপ ফিরে এসে যা খবর দিয়েছে তাতে মহান্তী আমারই মত অবাক। মামাবাবু নাকি এ বেলার মত ছাউনিতে আর ফিরবেন না। সরকার সাহেবের সঙ্গে তাঁর তাঁবুতে গিয়ে দুপুরের খাওয়া সারবেন। ক্যান্টিনের হেড কুক ছোটেলালকে আগে থেকেই নাকি সেখানে খাবার পাঠাবার কথা বলে দেওয়া হয়েছে।

ব্যবস্থাটা মহান্তীর কাছেও যে অপ্রত্যাশিত তা তাঁর মুখ দেখে বুঝেছিলাম। মামাবাবুর ওপর তাঁর অন্ধ ভক্তি। তবু সরকার সাহেবের সঙ্গে মামাবাবুর হঠাৎ এতটা মাখামাখি তাঁকে যে বেশ বিস্মিত করেছে মহান্তী সেটা লুকোতে পারেন নি।

শুধু বিস্ময় নয়, সরকার সাহেবকে নিয়ে এই বাড়াবাড়িতে আমার একটু রাগই হয়েছিল। একটু তেতো গলাতেই আমি মন্তব্য করেছিলাম,—সরকার সাহেবের মধ্যে মামাবাবু ত নতুন নিউটন-আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছেন মনে হচ্ছে!

মহান্তী কিন্তু মামাবাবুর বিষয়ে এটুকু ঠাট্টাও সহ্য করেন নি। হেসে বলেছিলেন, তোমার মামাবাবুকে এখনো ঠিক চেনো না মনে হচ্ছে!

এর পর মামাবাবুর বিষয়ে আর কোনো কথা তোলা উচিত মনে করি নি। বিকেলে বঙ্কুবাবুকে বকুনি দিতে যাওয়ার ফল যা দাঁড়িয়েছে তা আগেই জানিয়েছি।

রাত্রেও মামাবাবু আমাদের সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে যোগ দেন নি। বঙ্কুবাবুর মারফতই খবর পাঠিয়েছেন যে, তাঁর জন্যে অপেক্ষা যেন আমরা না করি। রাতের খাওয়াটাও তিনি সরকার সাহেবের তাঁবুতেই সারবেন।

শুধু রাতের খাওয়াটাই সেখানে সারেন নি, মামাবাবু সেখান থেকে ফিরেছেন প্রায় মাঝ রাতে।

বিছানায় শুয়ে তাঁর আসাটা টের পেয়েছি, কিন্তু মনের ক্ষোভ রাগ কৌতূহল তখনকার মত চেপে রাখতে হয়েছে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রথমটা অবাক যেমন হয়েছি তেমনি হতাশও। মামাবাবুর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ আজকেও বোধহয় মিলবে না।

মামাবাবু তাঁর বিছানায় নেই। উঠে খোঁজ করে জেনেছি ভোর না হতে উঠে রামস্বরূপকে নিয়ে লোধমা পাহাড় থেকেই নেমে গেছেন।

আমার কাছে হলেও মামাবাবুর এদিনের ভোরের এই অন্তর্ধান মহান্তীর কাছে অপ্রত্যাশিত নয় বলেই মনে হয়েছে।

আমি উদ্বেগ-উত্তেজনা নিয়েই মহান্তীকে খবরটা দিতে গিয়ে-

ছিলাম। যেরকম আশা করেছিলাম মহান্তীকে সে রকম বিচলিত না দেখে অবাক হয়েছি। একটু সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, মামাবাবুর আজ ভোরে বেরিয়ে যাবার কথা আপনি জানতেন না কি?

ঠিক জানতাম না।—মহান্তী গম্ভীরভাবেই বলেছেন,—তবে এই রকম আরো অনেক কিছুর জন্যে কাল থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছি। সেনবাবু কাল রাত্রে তার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন।

মহান্তীর কাছে মামাবাবু কখনো 'মিঃ সেন' কখনো 'সেনবাবু' কখনো আবার শুধু 'আপনার মামাবাবু' কেন হ'ন সেটা একটা গবেষণার বিষয়। মহান্তীর মন মেজাজের সঙ্গে সম্বোধন পাল্টে যাবার কোনো সম্পর্ক হয়ত আছে। তখন অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবস্থা নয়। 'সেনবাবু' শুনে একটু চমকালেও বিস্মিত প্রশ্নটাই করেছি,—আপনার সঙ্গে কাল রাত্রে মামাবাবুর কথা হয়েছিল? তিনি ত রাত প্রায় একটায় শুতে এসেছিলেন!

হাঁ,—মহান্তী স্বীকার করলেন,—তার আগে আমাকে ছাউনির বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করেন। আজই গুরুতর কিছু একটা ব্যাপারের হদিস পাওয়া যাবে বলে তখনই ইঙ্গিত করেছিলেন।

আমাকে একেবারে বাদ দিয়ে মহান্তীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপন আলাপ করার খবর শুনে ক্ষুণ্ণ বেশ একটু হয়েছি। কৌতূহলের সঙ্গে সেই জ্বালাটা পরের প্রশ্নে সম্পূর্ণ লুকোতে পারি নি।

একটু তেতো গলাতেই বলেছি, গুরুতর কিছুর হদিস সরকার সাহেবের দোলতেই পাওয়া যাচ্ছে নাকি? তাঁর সঙ্গে হঠাৎ এত দহরম মহরম এই জন্যে?

তা হতে পারে।—আমার মেজাজ দেখে মহান্তী এবার হেসে ফেলেছেন।

পাঁচ

মামাবাবু গত দুদিন যে রহস্য নিয়ে অত ব্যস্ত হয়ে আছেন সেটা যে কত বড় গুরুতর ও তার হদিস পাওয়ার ব্যাপারে সরকার সাহেবের ভূমিকা যে কতখানি, সেইদিন দুপুরেই তা জানা গেল।

মামাবাবু ফিরলেন বেশ বেলায়। সঙ্গে যেমন সন্দেহ করেছিলাম —সেই সরকার সাহেব। তাঁকে নিয়েই ভোরবেলায় মামাবাবু বেরিয়েছেন।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যাওয়ায় মহান্তীর সঙ্গে আমি বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়েই মামাবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মামাবাবু কোথায় গেছেন বলে যান নি। এখানকার নিষেধ নিজেই প্রথম ভেঙে লোধমা পাহাড় ছেড়ে তিনি নেমে গেছেন একটুকু শুধু জানা গেছে।

মুখে কিছু না বললেও মহান্তী যে খুব নির্বিকার নিশ্চিন্ত তা মনে হয় নি। লোধমা পাহাড় থেকে নামা-ওঠার সাধারণ রাস্তায় একটু এগিয়ে গিয়ে খোঁজ করবার কথা তুলতেই মহান্তী রাজী হয়ে গেছেন।

পাহাড় থেকে উৎরাই যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে একটা ঢিবির পাশে বড় একটা গাম্ভারি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে বৃথাই কিন্তু চারিদিক ব্যাকুলভাবে লক্ষ্য করেছি। বেশ একটু ভাবিত হয়ে নিচে খোঁজ করতে যাওয়ার জন্যে যখন তৈরী হয়েছি তখন ছাউনি থেকে রামস্বরূপ ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিয়েছে যে সরকার সাহেবের সঙ্গে মামাবাবু এই মাত্র ফিরে এসে আমাদেরই ডাকছেন।

সাধারণ রাস্তা ছেড়ে মামাবাবু তাহলে কোন্ চড়াই ভেঙে লোধমা পাহাড়ে উঠলেন? গেছলেনই বা তিনি কোথায়?

সে সব কথা জিজ্ঞাসা করবার ফুরসৎ মিলল না।

ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামাবাবু মহান্তীকে প্রায় যেন আদেশই দিলেন,—এখনই সকলকে জানিয়ে দাও যে লোধমা পাহাড় থেকে বাইরে যাওয়ার আর মানা নেই।

তার মানে?—সবিস্ময়ে প্রশ্নটা না করে পারলাম না,—সে ক্ষ্যাপা হাতীটা মারা পড়েছে, না এ তল্লাট ছেড়ে গেছে?

মারা পড়েছে কিনা এখনো জানি না,—মামাবাবু একটু তীক্ষ্ণস্বরে জানালেন,— কিন্তু এ তল্লাটে কোন দিন সে আসেই নি। মহান্তীর আদিবাসী চাপরাশী যেদিন জঙ্গলের পথে মারা পড়ে সেদিন অন্ততঃ নয়।

সে কি!—মহান্তী বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞেসা করলেন,—চাপরাশী তাহলে মারা গেল কি করে? তার হাতীর পায়ে থেঁতলানো লাশই ত পাওয়া গেছল।

তা যে গেছল সে ত শোনা কথা মাত্র—মামাবাবু বললেন,—নিজের চোখে ত কেউ আমরা দেখি নি। বাঙ্গুরকেলা থেকে পুলিশের একজন লোক এসে লাশ পোড়াবার অনুমতি দেওয়ার কথা। ক্ষ্যাপা হাতীর ভয়ে কেউ আসে নি। ওখান থেকেই হুকুম ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু চাপরাশী মারা পড়বার দিন ক্ষ্যাপা হাতীটা যে এ তল্লাটে আসে নি সেটা অমন নিশ্চিত জানলেন কি করে?—বেশ সংশয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম।

জানলাম, মহাবুয়াংএর একজন শিকারীর সঙ্গে কথা বলে।—সরকার সাহেব এবার জবাব দিলেন,—তিনি ওই দিনই মহাবুয়াংএর জঙ্গলে হাতীটার পেছনে অনেক ছোটাছুটি করেছেন। ভদ্রলোকের

সঙ্গে নিচের পাহাড়ী রাস্তায় আজই সকালে দেখা—মহাবুয়াং থেকে মিঃ নাগাপ্পার কাছে আসছেন।

নাগাপ্পার নামটা শুনে নিজের অজান্তেই কেন চমকে উঠলাম প্রথমে বুঝতে পারলাম না।

মামাবাবু যে খবরটা দিলেন তাতে লোধমা অঞ্চলের ক্ষ্যাপা হাতীর ভয়টা ঘুচল বটে, কিন্তু আরেকটা রহস্য গভীর শুধু নয় ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিল।

মহাবুয়াং থেকে ক্ষ্যাপা হাতীটা পাহাড় ডিঙিয়ে এদিকে আসেই নি। অন্ততঃ আদিবাসী পিয়নটি যেদিন মারা গেছে সেদিন মহাবুয়াং এর জঙ্গলেই সেটা যে ছিল, তার চাক্ষুষ প্রমাণ আছে।

আদিবাসী পিয়নটি তাহলে মারা গেল কিসে?

ক্ষ্যাপা হাতী তাকে পায়ে থেঁতলে মেরেছে এ খবরটাই বা রটল কেমন করে?

এ খবর লোধমা পাহাড়ে মহান্তীর কাছে যে নিয়ে এসেছিল সেই আদিবাসী দূতের পক্ষে মিথ্যে করে এমন একটা খবর বানানো ত সম্ভব নয়!

সম্ভব হলেও তাতে তার স্বার্থ কি?

মহান্তীর পিয়ন তার পাহাড়ী বসতি থেকে লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে কাজে যোগ দিতে আসছিল। গরীব পাহাড়ী আদিবাসী। কেড়েকুড়ে নেবার মত পয়সাকড়ি তার কাছে ছিল না নিশ্চয়। কোন সময়েই তা থাকে না। তাহলে তাকে নির্জন বনের রাস্তায় এমন ভাবে কে কি উদ্দেশ্যে মারতে পারে?

এ খুনটা কি তাদের নিজেদের গাঁয়েরই কোন রকম আকচা আকচি কি ঝগড়াঝাটির পরিণাম?

তা হওয়া প্রায় অসম্ভব। সভ্য মানুষের সংস্পর্শে বেশীদিন আসেনি বলে এ অঞ্চলের আদিবাসীরা এখনো তাদের নির্মল সরলতা হারায় নি। ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশেও এমন লুকিয়ে চুরিয়ে

খুন তারা করতে যাবে না। সে খুনকে ক্ষ্যাপা হাতীর কাজ বলে সাজাবার মত প্যাঁচাল বুদ্ধিও কাদের নেই।

মামাবাবু বলছেন যে হাতীর পায়ে থেঁতলানো লাশের কথা আমরা কানে শুনেছি মাত্র। তার চাক্ষুষ প্রমাণ নেই।

তা না থাকলেও যে আদিবাসী দূত খবরটা এনেছিল, সে অন্ততঃ চেহারা দেখেছে, তা নিশ্চয় হাতীর পায়ে থেঁতলানো বলে ভুল হতে শোনা কথার ওপর নির্ভর করে আসে নি। সে স্বচক্ষে মৃতদেহের যে চেহারা দেখেছে, তা নিশ্চয় হাতীর পায়ে থেঁতলানো বলে ভুল হতে

পারে। মৃত পিয়নটির লাশের ওই রকম পেষা দলা অবস্থা কেমন করে হল সেটাও একটা দুর্ভেদ্য রহস্য।

নিজের মনে এসব তোলাপাড়া করতে করতে সরজমিনে ব্যাপারটার তদন্ত করে আসা একান্ত দরকার বলে মনে হল।

পিয়নের মৃতদেহ সেখানে অবশ্য পড়ে নেই। অন্য চিহ্নটিহ্নও কিছু এতদিন বাদে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবু জায়গাটা স্বচক্ষে দেখে ও আদিবাসীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করে হয়ত রহস্যের কোনো খেই পাওয়াও যেতে পারে।

এছাড়া এ রহস্যভেদের আর কোনো উপায় ত আমি দেখতে পেলাম না।

আমার মাথায় যে বুদ্ধি এসেছে মামাবাবুর সঙ্গে সেটা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁকে পাচ্ছি কোথায়?

পেলেও এসব কথা শোনবার তাঁর সময় কই?

সেদিন দুপুরে ক্ষ্যাপা হাতীর এ অঞ্চলে উপদ্রবের গুজবটা মিথ্যে বলে জানিয়ে দেবার পর মামাবাবু আসল রহস্যভেদের কি রাস্তা নিয়েছেন, তা বোঝা আমার অসাধ্য।

দুপুরের স্নানাহার কোন রকমে নম-নম করে সেরেই তিনি তাঁর ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছেন। এবারে অবশ্য সেখানে প্রবেশ নিষেধ নয়। সরকার সাহেব ছাড়া মহান্তীকেও এবার ডেকে নিয়ে গেছেন।

মামাবাবু আর মহান্তীকে না জানিয়ে শুধু নিজের মতলবে আদিবাসীদের বসতিতে খোঁজ করতে যাওয়া উচিত হবে না বুঝে মরিয়া হয়েই বিকেল বেলা মামাবাবুর ল্যাবরেটরির তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলাম।

আমার অনাহুত আবির্ভাবে কারুর আপত্তি যেমন দেখা গেল না, তেমনি কোনো অভ্যর্থনাও নয়। সরকার সাহেব ও মহান্তী তবু একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন, মামাবাবু সেটুকু ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

তাঁরা তখন সামনে কটা ছেঁড়াখোঁড়া কাগজ রেখে তারই আলোচনায় তন্ময়।

আলোচনাটা আমার কাছে গোপন করবার কোনো চেষ্টা দেখলাম না, কিন্তু খানিকক্ষণ নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থেকে যেটুকু বুঝলাম, তাতে তা নিয়ে অত উত্তেজিত আলোচনা অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকল।

কাগজ কটা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িরই উপযুক্ত। সে রকম কোন জঞ্জালের জায়গা থেকেই সেগুলো কুড়িয়ে আনা হয়েছে। এনেছেন সরকার সাহেব।

টেবিলের ওপর যেটা রাখা ছিল সেটা তুলে নিয়ে একবার দেখলাম। কাগজটা দুমড়ে দলা পাকিয়ে কেউ ফেলে দিয়েছিল। সেটা এখন একটু আধটু টেনে টুনে পাত করবার চেষ্টা হয়েছে। কেন যে হয়েছে, তা বোঝা আমার অসাধ্য। তাড়াতাড়িতে এটা ওটা টোকবার জন্যে ব্যবহার করে তারপর কাজ হয়ে গেলে আজে বাজে কাগজ হিসাবে যা ফেলে দেওয়া হয়, এগুলো তার বেশী কিছু নয়।

আমি যেটা হাতে পেয়েছিলাম তাতে পেন্সিলে এক কোণে অস্পষ্ট ভাবে শুধু লেখা, 'মেটাল বুলেটিন ১৯৩৮ ৭৮ নম্বর, এক আউন্স,—ছত্রিশ ডলার।'

অন্য কাগজ কটায় সেই ধরনেরই আরো কিছু হয়ত আছে। লেখা যা আছে তা খনিজ সম্বন্ধে টুকিটাকি তথ্য বলেই মনে হয়। খবর হিসেবে হয়ত দামী, কিন্তু তথ্যের চেয়ে কাগজগুলোই বেশী উত্তেজনা জাগিয়েছে দেখলাম।

মামাবাবু তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সরকার সাহেবের কাছে কাগজগুলো কোথায় কি ভাবে পাওয়া গেছে জেনে নিচ্ছিলেন।

প্রথম কাগজটা ত ক্যান্টিনে যাবার রাস্তার ধারেই পেয়েছিলেন বললেন।—মামাবাবু সরকার সাহেবের স্মৃতিটা যেন উস্কে দেবার

চেষ্টা করলেন,—কিন্তু ও রকম একটা দলা পাকানো কাগজ রাস্তার ধারের ঝোপ থেকে তুলতে ইচ্ছে হল কেন ?

সরকার সাহেব সবিস্তারে তাঁর কাগজ পাওয়ার ইতিহাস এবার বলতে বসলেন।

কাগজগুলো পাওয়ার জন্যে জুতোজোড়ার কাছে নাকি তিনি ঋণী। নতুন কেনা জুতো। গোড়ালির দিকটায় এখনো একটু লাগে। সেদিন ক্যান্টিন থেকে ফেরবার সময় একটু বেশী লাগছিল বলে শুকতলার গোড়ালির দিকটা সামান্য উঁচু করবার জন্যে একটা কিছু খুঁজতে গিয়ে রাস্তার ধারে ঝোপের গায়ে দলা পাকানো কাগজের ডেলাটা দেখতে পান। তখনকার মত কাজে লাগিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে কাগজের ডেলাটা ফেলে দিতে গিয়ে হঠাৎ কি খেয়ালে সেটা খুলে দেখেন। খুলে ওই টুকিটাকি লেখাগুলোর কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে বলে প্রথম বুঝতে পারেন নি ··

সবকার সাহেব যে ভাবে তাঁর বিবরণ ফেঁদেছেন, তাতে কতক্ষণে তা শেষ হবে কে জানে!

বেশীক্ষণ আর ধৈর্য ধরতে না পেরে তাঁর কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে বললাম,—আমার সামান্য একটু কথা বলবার ছিল,—কথাও ঠিক নয়, আসলে একটু অনুমতি চাইতে·····

না, না অনুমতি চাইবার কি আছে!—মামাবাবু আমাকে শেষ করতেই দিলেন না। আমার কথাটার সম্পূর্ণ ভুল মানে করে কোন রকমে নিজেদের আলোচনায় ফিরে যাবার তাড়ায় বললেন,—তুমিও খোঁজ না। সে রকম কাগজপত্র কিছু পেলে তখ্‌খুনি আমাদের দেখাতে কিন্তু ভুলো না।

হতভম্ব হয়ে খানিক মামাবাবুদের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। তাঁরা ইতিমধ্যেই ছেঁড়া কাগজের দলার আলোচনায় ফিরে গিয়েছেন। আমি রইলাম কি গেলাম, সে খেয়ালও বোধ হয় নেই।

এরপর ভেতরে ভেতরে গজরাতে গজরাতে নিঃশব্দে চলে যাওয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে!

তাই গেলাম। এবং ল্যাবরেটরির তাঁবু থেকে বেরিয়েই বঙ্কুবাবুকে কাছাকাছি ঘুর ঘুর করতে দেখে হাতে যেন স্বর্গ পেলাম।

বঙ্কুবাবু আমায় বার হতে দেখে অপরাধীর মত সরে পড়বার চেষ্টায় ছিলেন। আমিই তাঁকে ডেকে থামালাম,—

শুনুন, শুনুন বঙ্কুবাবু! পালাচ্ছেন কেন!

বঙ্কুবাবু আমার ডাকটায় অভিযোগের গন্ধ কোথায় পেলেন জানি না, কিন্তু এবারে কাঁদুনে গলায় তাঁর এখানে উপস্থিত থাকার কৈফিয়ৎ দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আমার কি দোষ বলুন ত!—বঙ্কুবাবু আমাকেই সালিসী মানলেন,—জরুরী বলে যে চিঠিগুলো টাইপ করে পাঠাতে হুকুম দিয়ে এলেন সেগুলো সই ছাড়াই যাবে? এই আসেন এই আসেন ভেবে সেই বিকেল তিনটে থেকে অফিসে বসে আছি। হঠাৎ এসে পড়ে অফিসে না পেলেই ত কুরুক্ষেত্র বাধাবেন! বিকেলের চা জলখাবারটা পর্যন্ত ক্যান্টিনে খেতে যেতে পারি নি···

এইটেই আসল দুঃখের কারণ বুঝে বললাম,—চা জলখাবারটা অফিসেই ত আনিয়ে খেতে পারতেন বঙ্কুবাবু।

আনিয়ে খেতে পারতাম!—আমার কথা শেষ হতে না হতে বঙ্কুবাবু চিড়বিড়িয়ে উঠলেন,—ক্যান্টিনে সকলের ওপর কি হুকুম হয়ে গেছে জানেন? অফিসে আমাকে একটা বিস্কুটের টুকরোও কেউ যেন না এনে দেয়। আপনাদের সরকার সাহেব আমায় মানুষ বলে গণ্য করেন না, জানেন ছোটবাবু? আমি ওঁর কাছে একটা কুকুর বেড়ালের অধম। এই যে সই করাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, কতক্ষণ এ ভোগান্তি হবে বলুন ত!

আর ভোগান্তির দরকার নেই।—আমি হেসে আশ্বাস দিয়ে বললাম,—আপনি অনায়াসে আমার সঙ্গে ক্যান্টিনে আসতে পারেন।

ক্যান্টিনে যাবো, আপনার সঙ্গে!—বঙ্কুবাবুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেই, আবার যেন অন্ধকার হয়ে গেল,—কিন্তু সরকার সাহেব!

সরকার সাহেবের জন্যে কোনো ভাবনা নেই!—আমি বেশ জোর দিয়ে জানালাম,—ওঁরা যে গবেষণায় ডুবেছেন তা থেকে আজ রাত পর্যন্ত উঠতে পারবেন বলে মনে হয় না।

ঠিক বলছেন?—বঙ্কুবাবু উৎসুক ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে মনের ভাবটা যেন বোঝবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন,—আমায় বকুনি খাওয়াবার ফিকির করছেন না ত?

না, না!—একটু ধমকের সুরেই এবার বললাম,—আপনাকে মিছিমিছি বকুনি খাইয়ে আমার লাভ কি? বকুনির চেয়ে ভালো কিছু খাওয়াবার জন্যেই ক্যান্টিনে নিয়ে যাচ্ছি।

বঙ্কুবাবুর মুখ দেখে মনে হল, পারলে সিড়িঙে বকের মত চেহারা নিয়েই তিনি নৃত্য করতেন। তার বদলে গলাটা আরো তীক্ষ্ম করে তাঁর উল্লাসটা প্রকাশ করে বললেন,—ব্যস! রাত পর্যন্ত যদি খোঁজ করবার সময় না পায় তাহলে কাল আমাকে পাচ্ছে কোথায়?

কেন বলুন ত? একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

বাঃ কাল ছুটির দিন না!—বঙ্কুবাবু সরকার সাহেবের ওপর যেন এক হাত নেওয়ার মত করে জানালেন,—সরকার সাহেবের ত্রিসীমানায় আমি থাকব মনে করছেন?

কাল আপনার ছুটির দিন!—এ খবরটায় অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললাম,—তাহলে আমার সঙ্গে একটা কাজে আপনাকে থাকতে হবে।

কি কাজ?—বঙ্কুবাবু একটু যেন সন্দিগ্ধ হয়ে রাস্তার ওপর থেমে পড়লেন। ক্যান্টিনে খাওয়াতে চাওয়াটা কি ধরনের টোপ তাই বোধহয় তখন তিনি বোঝবার চেষ্টা করছেন।

শক্ত কিছু নয়।—তাড়াতাড়ি আশ্বাস দিয়ে বললাম,—চলুন ক্যান্টিনে বসেই বলব।

ছয়

ক্যান্টিনে বসে খাওয়াতে খাওয়াতেই বঙ্কুবাবুকে আমার মতলবটা জানালাম।

বঙ্কুবাবু ও সেই সঙ্গে আমার, দুজনেরই ভাগ্য সেদিন ভালো। এ কদিন ক্ষ্যাপা হাতীর ভয়ে দূরের রেলঘাঁটি গগনপোষ থেকে জিনিসপত্র আমদানি বন্ধ থাকায় ক্যান্টিনে একটু টানাটানি করে চালাতে হচ্ছিল। কতদিন হাতীর উপদ্রবে রাস্তাঘাট বন্ধ থাকবে তার ত ঠিক নেই। মালপত্র একবার ফুরোলে মাথা খুঁড়লেও আর পাওয়া যাবে না। যত দিন যাচ্ছিল, ক্যান্টিনের কর্তা ছোটেলাল তাই ততই খাবারদাবারের বেলা হাত গুটিয়ে নিচ্ছিল বাধ্য হয়ে।

সেদিন ক্ষ্যাপা হাতীর ভয় ঘুচে যাবার দরুন ছোটেলাল একেবারে দরাজ হাতে অনেক কিছু খাবার বানিয়ে ফেলেছে।

বঙ্কুবাবুকে চায়ের সঙ্গে প্লেট ভর্তি করে সিঙাড়া কচুরি পানতুয়া শুধু নয়, তার সঙ্গে টিন খুলিয়ে সসেজও ভাজিয়ে দিয়েছি।

এই সব চর্ব্যচোষ্যের সদ্ব্যবহার করতে করতে আমার প্রস্তাবটা শুনে বঙ্কুবাবু প্রথমটা কেমন একটু বিমূঢ়ই হলেন মনে হল। যার জন্যে এত ঘুষ, সে কাজটা বেশ গোলমেলে কিছু বলে তিনি নিশ্চয় আশঙ্কা করেছিলেন।

তার বদলে আমার সঙ্গে শুধু একটু আদিবাসীদের দূরের পাহাড়ী গাঁয়ে টহল দিতে যাওয়া। সে যাওয়াও আবার নিতান্ত নীরস বেকার হয়রানি নয়। সঙ্গের রসদ হিসেবে ছোটেলালকে স্যাণ্ডউইচ সসেজ ইত্যাদি যে পরিমাণ প্যাক করে রাখতে বললাম, তাতে বঙ্কুবাবু ব্যাপারটা সামান্য একটু দেরিতে বুঝে বিস্ফারিত চোখে আমার জয়ধ্বনিটা কোন রকমে যেন গলায় চেপে রাখলেন।

তাঁর রাজী হওয়াটা মুখের ভাষায় আর আমায় জানতে হল না।

আদিবাসী পিয়নটি যেখানে মারা গেছে, দূরের সেই জংলা পাহাড়ে পরের দিন যখন পৌঁছোলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা। ভোর পাঁচটার আগে লোধমা থেকে বেরিয়ে মাঝে আধঘণ্টা শুধু সঙ্গের ফ্লাস্ক ও ঝোলার চা জলখাবার খাওয়ার জন্যে এক জায়গায় বিশ্রাম করেছি। তার মানে পাক্কা সাড়ে চার ঘণ্টা সমানে আমাদের হাঁটতে হয়েছে। সময়টা কম নয়, কিন্তু সঙ্গে পথ দেখাবার জন্যে বঙ্কুবাবু না থাকলে এর ডবল হেঁটেও জায়গাটায় এসে পৌঁছোতে পারতাম কি না সন্দেহ।

বঙ্কুবাবুকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যে কত বড় সৌভাগ্য, রওনা হবার পরেই বুঝতে পেরেছি। এ অঞ্চলে ট্যাঙ্গস ট্যাঙ্গস করে বেড়ানোই বঙ্কুবাবুর কাজ শুধু নয়, বাতিকও। এ বেয়াড়া বেপোট পাহাড় জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি আদিবাসীরাও তাঁর মত জানে কিনা সন্দেহ। গোড়াতেই সোজা জানা রাস্তায় না গিয়ে যে পথ ধরে তিনি লোধমা পাহাড় থেকে আমায় নামালেন, সেটা কোন রকম রাস্তাই নয়। প্রায় অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা গরু ছাগলের পায়ে গড়ে ওটা একটা টানা দাগ মাত্র। কিন্তু প্রায় পাঁচ মাইল ঘুর বাঁচাবার এটাই নাকি একটা অজানা পাকদণ্ডী।

এ রকম 'সটকাট' বঙ্কুবাবুর পুঁজিতে আরো অনেক আছে। এই বিশেষ গুণপনার কথা জানা না থাকলেও আগের দিন বিকেলে মামাবাবুর ল্যাবরেটরির তাঁবু থেকে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে সামনেই যখন বঙ্কুবাবুকে দেখি, তখনই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তাঁকে একেবারে আদর্শ সহায় বলে বুঝতে পেরেছিলাম। যে কাজ আমি করতে যাচ্ছি, তার জন্যে মন্ত্রগুপ্তিটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সে দিক দিয়ে বঙ্কুবাবুর মত নিরাপদ নির্বোধ অথচ আমার যেটুকু দরকার সে দিক দিয়ে তোখোড় লোক সমস্ত লোধমা পাহাড়ে আর কাকে পেতাম!

শুধু এ অঞ্চলের ওয়াকিফহাল পথের দিশারী হিসেবেই বঙ্কু-বাবুর সঙ্গ মূল্যবান নয়, তাঁর একটা বিশেষ 'পয়'ও আছে দেখলাম।

আদিবাসী পিয়নের খুন হবার জায়গাটা একবার স্বচক্ষে দেখে যেতে এসে সেদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এমন কিছু একটা দেখবার ও জানবার সুযোগ হল, এ ধান্দায় আসার সময় যা সত্যি কল্পনাও করতে পারি নি।

দেখালেন আবার বঙ্কুবাবুই।

বেশ একটু বেয়াড়া চড়াই ভেঙে তখন আদিবাসীদের বসতির জংলা পাহাড়ের মাথার উপত্যকাটায় পৌঁছেছি। চারিদিকে অত্যন্ত ঘন শাল শিশু বেন্দু বাঘেড়ার বন।

তারই ভেতর দিয়ে বড় বড় পাথুরে ঢিবির পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বঙ্কুবাবু সামনে থেমে গিয়ে হাত নেড়ে আমায় পা বাড়াতে নিষেধ করেছেন।

তারপর উত্তেজিত চাপা গলায় পিছু ফিরে বলেছেন,—ওই টিবিটার আড়ালে থেকে দেখুন।

সন্তর্পণে ঢিবিটার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার আড়াল থেকে দেখে সত্যিই বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গেছি।

যেখানে পাথুরে ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে দূরের পাহাড়ী-প্রান্তরে একটা লোককে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখলাম। মানুষটি মাটির ওপর উবু হয়ে বসে কি যেন করছে। কি করছে এতদূর থেকে তা বোঝা না গেলেও মানুষটাকে নিজের কাছে তন্ময় বলেই মনে হল।

লোকটি আমাদের দিকে পিছু ফিরেই বসেছিল, কিন্তু তাতেও তাকে চেনবার জন্যে চোখে দূরবীন তোলবার দরকার হল না।

চেহারা পোশাকের আদল থেকেই লোকটির পরিচয় তখন আমি নির্ভুলভাবে বুঝে ফেলেছি। বোঝবার বিশেষ কারণ এই যে

আগের দিন মামাবাবুর কাছে কটি অদ্ভুত খবর শোনবার পর থেকে এই লোকটির কথাই সারাক্ষণ ভাবছিলাম।

হ্যাঁ, মামাবাবুর কাছে যার নাম শুনে অজান্তেই চমকে ওঠবার কারণটা গতকাল প্রথমে ঠিক বুঝতে পারি নি, ইনি সেই নাগাপ্পা।

পুরো একটা দিন মনের মধ্যে তোলাপাড়া করে নাগাপ্পা সম্বন্ধে বেশ কিছু রহস্যের খেই তখন পেয়ে গেছি॥

লোধমা পাহাড় থেকে দূরবীনে আদিবাসীদের করালী পাহাড়ে সেদিন যে এই নাগাপ্পাকেই উঠতে দেখেছিলাম এ বিষয়ে আমার মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই।

শুধু এই একটা ব্যাপারই নয়, নাগাপ্পার গতিবিধির মধ্যে সন্দেহজনক আরো কিছু আছে।

প্রথম দিন করালী পাহাড়ে তার সঙ্গে দেখা হওয়াটাই ত অদ্ভুত। আমি না হয় খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে যাওয়ার দরুন ক্ষ্যাপা হাতীর খবর আর লোধমা পাহাড় থেকে কোথাও যাবার নিষেধের কথা জানতে পারি নি, কিন্তু নাগা'প্পা ত এ খবর আগের রাত্রেই পেয়েছেন। মহান্তী লোধমার সব ছাউনিতেই ত ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

নাগাপ্পা সে নিষেধ অমান্য করে পরের দিন সকালেই তাহলে বার হয়েছিলেন কেন?

তাঁর সঙ্গে সেদিন যখন দেখা হয় তখন তিনি নিজের ছাউনিতে ফিরছেন। তার মানে আমার চেয়েও ভোরে তিনি লোধমা পাহাড় থেকে বেরিয়েছিলেন। মহান্তীর নিষেধ এভাবে অমান্য করে অত ভোরে বেরিয়ে যাবার কারণটা কি।

দেখা হবার পর তাঁর আর একটা ব্যবহারও অদ্ভুত। তিনি আদিবাসীদের 'এঞ্জা' পাহাড়ের পরিচয় দিয়ে সেখানে ওঠা সম্বন্ধে আমায় সাবধান করেছিলেন, কিন্তু ক্ষ্যাপা হাতীর ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও ত আমায় জানান নি।

নাগাপ্পা সম্বন্ধে এত কথা সে মুহূর্তে অবশ্য ভাবিনি।

অত তন্ময় হয়ে নাগাপ্পা কি করছেন সেইটেই তখন গভীর কৌতূহলের বিষয়।

আমাদের এখন কি করা উচিত সেটাও ঠিক করতে পারছিলাম না।

সোজাসুজি এগিয়ে গিয়ে নাগাপ্পার সামনে হাজির হবার বাধা কিছু নেই।

নাগাপ্পা যদি আসতে পেরে থাকেন তাহলে আমরাই বা এ পাহাড়ে টহল দিতে আসতে পারব না কেন? সোজা গিয়ে দেখা দিয়ে নাগাপ্পা কি করছেন জিজ্ঞাসাও করা যায়।

নাগাপ্পা তাহলে কি করবেন?

যা তিনি করছেন তা খুব প্রাণ খুলে জানাবার কাজ নিশ্চয় নয়। সুতরাং আমাদের দেখতে পেয়ে খুব খুশী বোধহয় তিনি হবেন না।

কিন্তু অসন্তোষটা কি চেহারা নেবে তারপর?

বেশ একটু অসুবিধেয় পড়লেও একটা কিছু ঝুটো কৈফিয়ৎ দিয়ে তিনি ব্যাপারটা নির্দোষ বলে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন কি? তা করা-ই সম্ভব।

তা যদি করেন তাহলে লোকসান কিছু নেই। তাঁর কৈফিয়ৎটা মেনে নেবার ভান করে আমরা আসল রহস্যটা তারপর সন্ধান করবার চেষ্টা করতে পারি।

কিন্তু নাগাপ্পার প্রতিক্রিয়াটা গোড়াতেই সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

ছোটখাট অপরাধ নয়, রীতিমত একটা মানুষ খুনের ব্যাপার। সে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে একটা দৈব দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেবার যে কৌশল করা হয়েছে তার ভেতরেও দারুণ শয়তানী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

এ সব কাণ্ডকারখানার সঙ্গে নাগাপ্পার সত্যিই যদি গোপন

সংশ্রব থাকে তাহলে তিনি এ জায়গায় আমাদের হঠাৎ উদয় হতে দেখে শুধু একটু মিথ্যে কৈফিয়ৎ দিয়ে সাধু সাজবার চেষ্টা নাও করতে পারেন।

এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর অবশ্য আর নেই। এ সময়ে এখানে তাঁর লুকিয়ে আসা-ই তার প্রমাণ।

এ অবস্থায় তাঁর গোপন কাণ্ডকারখানার অবাঞ্ছিত সাক্ষী হিসেবে আমাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থার কথা তাঁর মনে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

আমরা গুনতিতে দুজন। কিন্তু দুজনেই নিরস্ত্র, তার ওপর বঙ্কুবাবু ত যাকে বলে একেবারে শূন্য,—সহায়ের বদলে দায়।

নাগাপ্পার মত মানুষ এখানে শুধু হাতে নিশ্চয় আসেন নি। তা ছাড়া হাতে একবার খুনের রক্ত যার লাগে, দ্বিতীয়বার সে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে বলেই জানি। আদিবাসি চাপরাশির থেঁৎলানো দেহটা যেখানে পাওয়া গেছে তারই কাছাকাছি আর দুটো লাশ রেখে দিয়ে যেতে নাগাপ্পার মত মানুষের দ্বিধা সঙ্কোচ খুব বেশী সুতরাং হবে না।

আমাদের মতো দুটো বেয়াড়া সাক্ষীর মুখ চিরকালের মত বন্ধ করে দেওয়ার এমন সুযোগই বা নাগাপ্পা ছাড়বেন কেন?

এই নির্জন পাহাড়ে কোথায় কি হচ্ছে কেউ দেখবার নেই। পিস্তল ছুঁড়ে যদি কেউ আমাদের খতম করে তার শব্দটা পর্যন্ত পাহাড়ের এ ঢাল ছাড়িয়ে ওদিকের আদিবাসীদের গ্রামটা পর্যন্ত পৌঁছবে না।

মনে মনে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই এতগুলো যুক্তি সাজিয়েও নিজেকে সামলানো শক্ত হয়ে উঠল।

এত বড়ো একটা সুযোগ পেয়েও নাগাপ্পাকে শুধু দূর থেকে লক্ষ্য করে সন্তুষ্ট থাকতে পারলাম না। সামনা সামনি গিয়ে

উপস্থিত না হই, নাগাপ্পা অত তন্ময় হয়ে কি করছেন আরো একটু কাছে গিয়ে লুকিয়ে না দেখাটা লজ্জাকর কাপুরুষতা বলে মনে হল।

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বঙ্কুবাবুকে নীরব থাকবার ইসারা করে পাথুরে ঢিবিগুলোর পাশ দিয়ে গুঁড়ি মেরে দু পা-র বেশী কিন্তু এগুতে পারলাম না।

পেছন থেকে লম্বা সিড়িঙ্গে হাত বাড়িয়ে বঙ্কুবাবু আমার একটা পা তখন ধরে ফেলেছেন। চমকে ফিরে তাকিয়ে তাঁর মুখ চোখের যে চেহারা দেখলাম তা ভোলবার নয়।

সেখানে করুণ মিনতি, না হতাশ আতঙ্ক, না আমার আহম্মকিতে অক্ষম রাগ, কোনটা ফুটে উঠেছে বোঝা শক্ত। সব কটা ভাবই বোধহয় একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

বঙ্কুবাবু অমন করে ধরে ফেলায় চমকে ওঠার সঙ্গে বেশ একটু গরমই প্রথমে হয়ে উঠেছিলাম। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই তিনি কত বড় উপকার যে করেছেন তা টের পেলাম।

পাথুরে ঢিবির আড়ালেই তখনো দুজনে আছি। বঙ্কুবাবুর ধরা, আর আমার দু পা গিয়ে ফিরে দাঁড়ানতে নিচের শুকনো ঝরা পাতায় শব্দ যা হয়েছে তা নামমাত্রই বলা উচিত।

কিন্তু নাগাপ্পা শয়তান গোছের মানুষ বলেই বোধ হয় তাঁর কান শিকারীর মত সজাগ।

দুটো বড় পাথুরে ঢিবি আর তার সামনের একটা চারা শাল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নাগাপ্পাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম ওই সামান্য শব্দেই তিনি হুঁশিয়ার হয়ে ফিরে বসেছেন। শুধু ফিরে বসেন নি, ডান হাতটাও তাঁর আমাদের এই পাথুরে ঢিবি-গুলোর দিকেই তোলা। ভালো করে এত দূর থেকে দেখা না গেলেও তাতে একটা পিস্তলই ধরা আছে বুঝলাম।

পাথুরে ঢিবি দুটোর আড়ালে সামনের ঝোপগুলোর ভেতর

দিয়ে আমাদের দেখতে পাওয়া নাগাপ্পার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। তিনি শুধু শুকনো পাতার ওপর আমাদের ক্ষণিকের নড়াচড়ার শব্দই পেয়েছেন, কিন্তু তাহলে অতটা অস্থির হয়ে তাঁর পিস্তল উঁচিয়ে ধরাটাই বেশ একটু অস্বাভাবিক নিশ্চয়। শুধু বন্য কোন জন্তুর ভয়েই কি এই উত্তেজিত হুঁশিয়ারী? যে কথা বিশ্বাস করা শক্ত। এসব অঞ্চলে হিংস্র শ্বাপদ নেই এমন নয়। কেঁদো না হোক্ চিতা আর ভালুকের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। এখন সব কিছু উল্টে গেলেও প্রথমে সেই শিকারের লোভেই এখানে এসেছিলাম।

কিন্তু সে সব শিকারের জানোয়ারের ত এই দুপুর বেলায় এ রকম পাহাড়ের মাথায় হানা দিতে আসা প্রায় অসম্ভব। নাগাপ্পার অমন সজাগ সতর্কতার লক্ষ্য অন্য কিছু বলেই তাই মনে হল।

অনুমানে যে ভুল হয়নি তৎক্ষণাৎ তার অস্বস্তিকর প্রমাণ পেলাম। নাগাপ্পা হঠাৎ উঠে পড়ে হিংস্র শ্বাপদের তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়েই সন্তর্পণে এক-পা এক-পা করে আমাদের ঢিবিটার দিকেই এগিয়ে আসতে শুরু করলেন। পিস্তলটা ডান হাতে আগের মতই উঁচানো।

আমাদের অবস্থা তখন যে কি তা বোঝানো শক্ত। কি যে করা উচিত তা ঠিক করতে না পেরে অস্থির যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে তখন অসহ্য হয়ে উঠছে।

যেভাবে নাগাপ্পা এগিয়ে আসছেন তাতে মিনিট পাঁচেক বাদেই ত আমাদের ঢিবিটার কাছে পৌঁছে যাবেন।

ততক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে এখানে লুকিয়ে থাকব, না ছুটে পালাব এখন-ই?

পিস্তলের লক্ষ্যভেদ খুব শক্ত বলে জানি। সেই ভরসায় এখনই ছুটে পালালে হয়ত গুলি খেয়ে মরার পরিণামটা এড়াতে পারি।

কিন্তু সত্যিই কি নাগাপ্পা আমাদের মারতে পিস্তল ছুড়বেন? সভ্য জগতের মানুষ হয়ে সে কথাটা মন সহজে বিশ্বাস করতেই চায় না। ছুটে পালান বা চুপ করে লুকিয়ে থাকার বদলে এখনই উঠে দাঁড়িয়ে নাগাপ্পাকে দেখা দেবার কথাও তাই একবার মনে

হল। বন্ধুবাবুর দিকে ফিরে তাঁর মনের অবস্থাটা অনুমান করবার চেষ্টা করলাম। চোখের আর হাতের ইসারায়, উঠে দাঁড়িয়ে দেখা দেবার প্রস্তাবটাও চাইলাম তাঁকে বোঝাতে।

বুঝতে পারুন বা না পারুন তিনি হাত নাড়ার ইঙ্গিতে অত্যন্ত

কড়া ভাবে যেমন আছি তেমনি নিঃশব্দে অপেক্ষা করতেই বললেন বলে মনে হয়।

বোকাসোকা পেটুক ভালোমানুষ হলে কি হয় বঙ্কুবাবুর ভেতরের চোখ যে আমার চেয়ে তীক্ষ্ণ পরমুহূর্তেই তার প্রমাণ পেলাম। তাঁর বারণ না মানলে এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত সেদিনই হয়ে যেত এটুকু এখন বলতে পারি।

উঠে দেখা দেওয়া বা ছুটে পালান, দুটোর কোনোটাই না করে পাথুরে ঢিবির ফাঁক দিয়ে তখন নাগাপ্পাকে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে লক্ষ্য করছি।

নাগাপ্পা আরো কয়েকটা পা এগিয়ে এলেই আমাদের দেখতে পাবেন এইটেই তখন ভয়।

কিন্তু নাগাপ্পা আচমকা যা করে বসলেন সেইটেই অপ্রত্যাশিত। এগিয়ে আসতে আসতে নাগাপ্পা হঠাৎ পিস্তলটা ছুড়ে বসবেন এটা সত্যিই ভাবতে পারি নি।

একবার নয় দু-দুবার নাগাপ্পা সামনের দিকে আমাদের ঢিবিটার মাথা ডিঙিয়েই পিস্তল ছুড়লেন। গুলিগুলো বৃথাই অবশ্য খরচ হ'ল।

যা ভেবেছিলাম সেই মত হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে দেখা দিলে কি যে হত তা ভালো ভাবেই অনুমান করে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে তখন নাগাপ্পার পরের গুলির জন্যে অপেক্ষা করছি।

নাগাপ্পা কিন্তু আর গুলি ছুড়লেন না, এগিয়েও এলেন না আর আমাদের দিকে। যেভাবে খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সামনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে তিনি আবার আগেকার জায়গায় ফিরে গেলেন তাতে আগের সন্দেহটা ভুল বলেই তিনি বুঝছেন বলে মনে হ'ল।

নাগাপ্পা ফিরে যাওয়ায় তখনকার মত হাফ ছেড়ে অবশ্য বাঁচলাম কিন্তু সেদিনকার বিপদ সবে যে তখন সুরু তা কি জানি।

নাগাপ্পা ফিরে গিয়ে আর সে জায়গায় বসলেন না। মাটিতে যে একটা ঝোলা গোছের পড়ে ছিল, এতক্ষণ তা দেখতে পাইনি। সেটার মধ্যে নিচে থেকে কি যেন দু একটা জিনিস ভরে নিয়ে ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নাগাপ্পা সামনের দিকে জংলা পাহাড়ের উল্টো দিকের আদিবাসীদের গাঁয়ের পথই ধরলেন।

নাগাপ্পা পাহাড়ের মাথা পেরিয়ে অন্য দিকের ঢালে একেবারে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত একেবারে নিস্পন্দ নীরব হয়ে রইলাম।

চলে যাবার সময় একটিবারও আমাদের দিকে ফিরে না তাকানতে নাগাপ্পার মনের সন্দেহ দূর হয়ে গেছে বলে বুঝেছিলাম, তবু সাবধানের মার নেই। নাগাপ্পা পাহাড়ের ওপিঠে নেমে যাবার পরও বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে তারপর সন্তর্পণে সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

নাগাপ্পা অত তন্ময় হয়ে কি করছিলেন সেইটেই জানবার চেষ্টা করতে হবে।

জায়গাটায় পৌঁছে কিন্তু হতাশই হলাম। পাহাড়ী মেঠো জমি বেশ শক্ত মাটির ওপর এখানে সেখানে শাল কেঁদু, বয়ড়া বা অন্য বুনো কাঁটা গাছের চারার ছোটখাট সব ঝোপ। খানিকটা দূরেই পাহাড়তলির রাস্তার সেই জায়গাটা যেখানে আদিবাসীর থেঁতলানো লাশ পাওয়া গেছে। আদিবাসীদের সেখানে পোঁতা একটা লম্বা খুঁটির গায়ে বিদঘুটে মুখ-আঁকা একটা মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখার দরুনই জায়গাটা চিনতে পারলাম। বিদঘুটে মুখ-আঁকা হাঁড়িটা ঝোলান হয়েছে ভূত-প্রেত তাড়াবার জন্যে। উপদ্রবটা ক্ষ্যাপা হাতীর বা যারই হোক তার পেছনে ভূত-প্রেতের হাত থাকতে বাধ্য এই তাদের বিশ্বাস।

বিদঘুটে মুখ-আঁকা হাঁড়িটা যেখানে ঝোলানো সেখানকার বদলে এ জায়গায় নাগাপ্পা কি করছিলেন প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর শক্ত লালচে মাটির ওপর একটু যেন কি ঘষার দাগ

পেলাম। মাটির ওপর থেকে কোন কিছু চেঁছে নিলে যেরকম দাগ পড়ে অনেকটা সেই রকম।

বঙ্কুবাবুই সে দাগটা প্রথম লক্ষ্য করে দেখিয়ে দিলেন। উৎসাহভরে আমার পাশেই বসে পড়ে বললেন,—নাগাপ্পা কি করছিলেন, বুঝেছেন এবার? কি একটা এখান থেকে চেঁছে তুলছিলেন। এইত ঘষার দাগ।

তাত বুঝলাম। গোন্দোগিরিতে বঙ্কুবাবুর কাছে হার মেনে আপনা থেকেই একটু রুক্ষস্বরে বললাম, কিন্তু চেঁছে তুলছিলেন কি? লোকটা মরল ওই রাস্তায়, এখানে তার কি প্রমাণ ছিল যে সরাচ্ছিলেন!

কি সরাচ্ছিলেন তাও বঙ্কুবাবুরই প্রথম চোখে পড়ল। একটা কাঁটা গাছের তলায় ছোট একটা যেন গোবরের ডেলা পড়েছিল আগে দেখতে পাই নি। বঙ্কুবাবু সেইটে একটা কাঠি দিয়ে টেনে এনে সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন,—এই জিনিস নয় ত?

জিনিসটা কি?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—গোবরের মত দেখাচ্ছে!

না গোবর নয়! বঙ্কুবাবু এবার জোর দিয়ে বললেন, তবে অন্য কোন জানোয়ারের বিষ্ঠাই মনে হচ্ছে। একটা টুকরো শুধু পড়ে আছে।

নাগাপ্পা এই জিনিস অত তন্ময় হয়ে চেঁছে তুলছিলেন? আমি অবাক হয়ে বঙ্কুবাবুর দিকে তাকালাম,—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

বিশ্বাস ত আমারও হচ্ছে না। বঙ্কুবাবু আমার কথায় সায় না দিয়ে পারলেন না,—কিন্তু এখানে ত যত্ন করে নেবার মত আর কিছুই দেখছি না।

এখন আর দেখবেন কি করে!—আমি ঠাট্টার সুরে বললাম,—যা ছিল তাত নাগাপ্পা তুলে নিয়ে গেছেন। তবে জায়গাটা ভালো করে একটু খুঁজে দেখা দরকার।

খোঁজ করতে গিয়ে ওরকম একটা মোক্ষম নিদর্শন পেয়ে যাব তা অবশ্য কল্পনাও করি নি।

এবারে আর বঙ্কুবাবু নয়, আবিষ্কর্তা আমি নিজেই।

প্রথমে নাগাপ্পা যে জায়গাটায় বসেছিলেন সেখানটা বেশ তন্ন তন্ন করে দেখে আদিবাসী পিয়নের লাশ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল পাহাড়ী রাস্তার সেই অংশটাও পরীক্ষা করেছিলাম।

কয়েকদিন আগের ঘটনা। পাহাড়ী ডাঙায় বা রাস্তায় সে বীভৎস ব্যাপারের কোন চিহ্নই এখন আর নেই। পাহাড়ের ওপর বেলা বাড়ার সঙ্গে রোদে ঝলমল করছে চারিদিক, তারই সঙ্গে চারিদিকের বনে যে হাওয়ার মর্মর শোনা যাচ্ছে তা মিলে এমন একটা শান্ত মধুর পরিবেশ গড়ে তুলেছে যে এ পবিত্র জায়গায় অমন একটা পৈশাচিক ব্যাপার কখনো ঘটতে পারে বলেই বিশ্বাস হয় না।

খুনের জায়গাটা দেখবার পর থেকেই বঙ্কুবাবু বাড়ি ফেরার জন্যে তাগাদা দিচ্ছিলেন। দুপুরের খ্যাঁটটার দেরী হয়ে যাবার দুর্ভাবনাতেই তাঁর এই তাড়া বুঝেছি। তাড়ার আসল কারণটা ওই হলেও তাঁর যুক্তিটা খুব অগ্রাহ্য করবার নয়।

যা দেখবার তা ত দেখলেন,—বেশ একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলেছেন বঙ্কুবাবু—খুনের খেই পেতে সারা জঙ্গলটাই খুঁজতে হবে নাকি!

মুখে কিছু জবাব না দিয়ে প্রায় সেই আজগুবী কাণ্ডটাই করেছি, আর তাইতেই পেয়ে গেছি সেই আশাতীত খেইটা। পেয়েছি অবশ্য একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায়।

সাত

বঙ্কুবাবুকে বিরক্তমুখে পাহাড়ী রাস্তাটার ধারেই বসিয়ে রেখে আশপাশের জঙ্গলটা অকারণেই ঘুরে দেখছিলাম। কাজটা যে আহাম্মুকের মত হচ্ছে সেটা যে একেবারে বুঝিনি তা নয়। কিন্তু বনের ভেতরে ঢুকে পড়ে পা দুটো যেন আপনা থেকেই সামনে চলে যাচ্ছিল।

বেশ কিছুটা ওইভাবে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখবার মত কিছুই অবশ্য পাইনি। আর দেরী করলে বঙ্কুবাবু হয় ত ক্ষিদের জ্বালায় রাগ করে একলাই রওনা দেবেন ভেবে ফিরতে গিয়ে হঠাৎ পা হড়কে একটা গর্তের মধ্যেই পড়ে গেলাম।

এখানটা জঙ্গল বেশ গভীর। তলায় শুকনো পাতা এমন ঘন হয়ে জমে আছে যে মাটি দেখাই যায় না। পা-টা একটা গোল কাটা ডালের ওপর পড়ে হড়কে যাবার পর যে গর্তটার মধ্যে চলে গিয়েছিল ওপর থেকে তার অস্তিত্ব টেরই পাওয়া যায় নি।

অমন বেকায়দায় পড়ে গিয়েও পা-টা যে ভাঙে নি তারই জন্যে ভাগ্যের ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে আবার দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে নিজের জুতোটার দিকে নজর দিয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

পায়ে গোড়ালি-আঁটা স্যাণ্ডাল পরা ছিল।

পায়ে আর জুতোয় ওটা কি লেগে?

এ তো কিসের ছাই দেখা যাচ্ছে! এখানে এই জঙ্গলের ঠিক একটি জায়গায় এরকম ছাই থাকার মানে কি? কাছেপিঠে কেউ কোথায় আগুন জ্বালিয়েছে বা রাঁধাবাড়া করেছে এমন কোন চিহ্নও নেই।

ওপরে নয়, ছাইটা এমন একটা গর্তের ভেতরই বা চাপা দেওয়া কেন ?

যেভাবে গর্তের ভেতর রেখে ওপরে শুকনো ঝরাপাতা দেওয়া হয়েছে, তাতে লুকোবার চেষ্টাটা অত্যন্ত স্পষ্ট।

গর্তের ভেতর ছাই-এর সঙ্গে আর কি আছে দেখবার জন্যে সেখানে বসতে গিয়ে শুকনো পাতার ওপর পায়ের শব্দে চমকে সেদিকে তাকালাম।

না ভয় পাবার মত কেউ নয়। আমার দেরী দেখে ধৈর্য ধরতে না পেরে বঙ্কুবাবুই বকের মত লম্বা ঠ্যাং চালিয়ে খুঁজতে এসেছেন।

ক্ষিদের জ্বালায়, অধৈর্যে আর আমার বিরুদ্ধে অক্ষম রাগে তাঁর মুখখানার চেহারা যা হয়েছে তা অন্য কারুর হলে ভয় পাবার মতই বলতাম, কিন্তু বঙ্কুবাবুর বেলা তাতে হাসিই পেল।

কাছে এসে প্রায় জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার আমার আর একবার সামনের গর্তটার দিকে চেয়ে বঙ্কুবাবু তাঁর মেয়েলী সরু গলাটাকে যেন আরো তীক্ষ্ণ ছুঁচোলো করে তাঁর অভিমান আর অভিযোগটা প্রকাশ করলেন,—আমায় এমনি করে জব্দ করার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছেন! আমায় একলা ফেলে রেখে এসে আপনি খেলা করছেন এখানে!

খেলা নয় বঙ্কুবাবু, খেলা নয়,—বঙ্কুবাবুর গলার স্বরে আর বলার ধরনে হেসে ফেলেও তাঁকে ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—এই গর্তটায় কি পেয়েছি দেখছেন? ছাই।

ছাই!—আমি যেন তাঁর সঙ্গে পরিহাস করছি এমনিভাবে কথাটা নিয়ে বঙ্কুবাবু আরো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন,—আমি না হয় মুখ্খু হাঁদা গাঁইয়া, কিন্তু দুটো ভালো মন্দ মাঝেসাঝে খাওয়ান বলে আমার সঙ্গে এরকম তামাসা করাটা কি উচিত ছোটবাবু? গর্তে ছাই আছে ত আমাদের কি!

বঙ্কুবাবু যত রাগেন তাঁর চেহারা আর গলা তত হাস্যকর হয়ে ওঠে। এবার কিন্তু হাসি সামলে গম্ভীর হয়েই তাঁকে ব্যাপারটা বোঝাতে ব্যস্ত হলাম। নিচে থেকে খানিকটা ছাই হাতে তুলে নিয়ে বললাম,—এ ছাই-এর মধ্যে কি দারুণ রহস্যের ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে তা এখনো বুঝতে পারছেন না? ভালো করে চারিদিকে চেয়ে দেখুন। কোথাও আগুন জ্বালার কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন কি?

আমার দিকে যে ভাবে বঙ্কুবাবু চাইলেন তাতে মনে হল আমার মাথা কতখানি খারাপ হয়েছে তা-ই যেন তিনি আঁচ করবার চেষ্টা করছেন। মুখে শুধু একটু বিস্মিত প্রশ্নই করলেন,—আগুন না হলে ছাই এল কোথা থেকে?

ঠিক ধরেছেন!—আমি উৎসাহভরে উঠে দাঁড়ালাম, ছাই যখন রয়েছে তখন আগুন নিশ্চয়ই জ্বালা হয়েছিল। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন নেই কেন?

বঙ্কুবাবুকে বোঝাবার নামে নিজের কাছেই যুক্তিগুলোই ভালো করে সাজাবার চেষ্টা করে বললাম,—আদিবাসীরা পাহাড় জঙ্গলে আগুন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া জ্বালে না। তারা সাধারণতঃ পাহাড়ের জঙ্গল সাফ করবার জন্যে বা চাষের জন্যে জমি উদ্ধার করতে বছরে একবার চৈত্র বৈশাখ মাসে বনে আগুন লাগায়। এখন সে সময় নয়, আর সে আগুনের প্রমাণ খুঁজতে হয় না। এখানকার আদিবাসীদের পাহাড় জঙ্গলের যেখানে সেখানে রান্নার জন্যে এক বেলার উনুন পাতা দস্তুর নয়, আর সে উনুনও লুকোন থাকে না। এখানকার আগুনের কোন চিহ্ন যখন নেই তখন নিশ্চয়ই তা জ্বেলে তারপর লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বঙ্কুবাবুর চোখে-মুখেও অধৈর্য বিরক্তি কেটে গিয়ে তীব্র আগ্রহ ফুটে উঠতে দেখে একটু থেমে প্রায় নাটুকে সুরেই জিজ্ঞাসা করলাম, —লুকোবার কারণ কি?

খুনের ব্যাপারের নিদর্শন গোছের কিছু এখানে পুড়িয়ে লুকিয়ে

রাখা হয়েছে বলতে চাইছেন?—বঙ্কুবাবু দু-চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকেই যেন ভেদ করার চেষ্টায় বললেন,—কিন্তু তাই যদি হয় তাহলেও প্রমাণ ত সব ছাই হয়ে গেছে। এখন আর ও ছাই কি কাজে লাগবে!

এখনো অনেক কাজে লাগতে পারে—আমি জোর দিয়ে বললাম,—প্রথমতঃ এ গর্তটা থেকে ছাই-এর সঙ্গে অন্য কিছুও হয়ত পাওয়া যেতে পাবে। আর তা যদি না পাওয়া যায় তাহলেও ওই ছাই কিসের জানতে পারলে এ খুনের ব্যাপারের একটা কোনো হদিস হয়ত মিলে যেতে পারে!

আর কিছু বলতে হল না। আমার কথা শেষ হবার আগেই দেখি বঙ্কুবাবু গর্তের ধারে বসে পড়ে মুঠো মুঠো ছাই তুলে তাঁর পকেটে ভরছেন।

তাঁর আগেকার রাগ বিরক্তি দেখে যেমন, বঙ্কুবাবুর এখন কার উৎসাহ দেখেও তেমনি হাসি পেল। সে হাসি চেপে গর্তের সব ছাই-ই শুধু নিয়ে যাবার দরকার নেই বলে তাঁকে থামাতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার দরকার হল না।

বঙ্কুবাবু নিজেই হঠাৎ থেমে গিয়ে আমাকেই যেন সাধধান করার ভঙ্গিতে বললেন,—এ গর্ত এরকম ভাবে ঘাঁটা খুব অন্যায় হচ্ছে তা জানেন! আমাদের আনাড়ি হাতের ঘাঁটাঘাঁটিতে আসল যা প্রমাণ তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর কিছু সুতরাং ছোঁয়াও চলবে না।

বঙ্কুবাবুর কথাটা ঠিক। তবু মনের খুঁতখুঁতনিটা প্রকাশ না করে পারলাম না,—কিন্তু গর্তের তলায় আর কিছু আছে কিনা একটু দেখলে বোধ হয় হত!

বঙ্কুবাবু তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমার একটা হাত ধরে ফেলে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে যেতে যেতে বললেন,—না, তাছাড়া এখাতে আর দেরী করে নাগাপ্পার কাছে কি ধরা পড়তে

চান? সে যে কোন মুহূর্তে এই পথেই ফিরতে পারে তা ভেবে দেখেছেন?

এ কথার ওপর সত্যিই আর বলবার কিছু পেলাম না। বেশ একটু সন্ত্রস্ত হয়েই বঙ্কুবাবুর সঙ্গে সে তল্লাট ছাড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা চালালাম।

আট

বঙ্কুবাবুর একটা যুক্তি মেনে আদিবাসীদের পাহাড় থেকে নেমে এসেছিলাম কিন্তু তাঁর আরেকটা পরামর্শ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়ার জন্যে নিজেদের লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে ফিরে অমন আফসোস সেদিন করতে হবে কল্পনাও করি নি।

বঙ্কুবাবুর সঙ্গে তাঁর জানা 'সর্ট-কাট'-এ কিছুদূর নামবার পর এক জায়গায় সাধারণ ব্যবহারের পাহাড়ী রাস্তাটা সামনে পড়েছিল। সে রকম সম্ভাবনা হলেও দুজনে এক সঙ্গে যাতে নাগাপ্পার চোখে না পড়ি—তার জন্যে বঙ্কুবাবু আমায় সাধারণ রাস্তাটা ধরেই লোধমা পাহাড়ে ফিরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি যা কারণ দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে তখন কোনো খুঁত পাইনি। তাঁর পরামর্শ নিয়ে তাই একা একাই লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে ফিরেছিলাম।

ছাউনিতে পৌঁছে প্রথমেই অবাক হয়েছিলাম বঙ্কুবাবু তখনও ফেরেন নি জেনে। তিনি যে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে আসছেন তাতে তাঁর ত আমার আগে পৌঁছবার কথা।

বিস্ময়টা শেষ পর্যন্ত ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্তও বঙ্কুবাবু না ফেরায়।

কাউকে কিছু তখনো জানাতে পারি নি। নিজেই খবর নিয়ে যা জেনেছি তাতে আতঙ্ক আরো বেড়েছে। শুধু বঙ্কুবাবুই নয় লোধমা পাহাড়ে নাগাপ্পাকেও কেউ নাকি সারাদিন দেখে নি।

নাগাপ্পাকে তার পর দিন সকালে ফিরতে দেখেছি কিন্তু বঙ্কুবাবু তখনও নিরুদ্দেশ। নেহাত বঙ্কুবাবুর মত মানুষ বলেই আমি ছাড়া কেউ বোধহয় তা লক্ষ্যই করে নি।

পরের দিন বেলা দুপুর পর্যন্ত বঙ্কুবাবু যখন ফিরলেন না, তখন রীতিমত অস্থির হয়ে উঠলাম। আমার ভয়টা শুধু নিজের মনের আর চেপে রাখতেও পারলাম না।

নিজেই একবার বঙ্কুবাবুর খোঁজ করতে যেতে পারতাম। সে কথা একবার ভেবেওছিলাম। কিন্তু তারপরই মনে হল ব্যাপারটা সম্ভবতঃ অনেক বেশী গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু আমার নিজের ক্ষমতার ওপর ভরসা করে একলা কিছু করতে যাওয়া উচিত নয়।

মামাবাবু কিংবা তাঁর বদলে মহান্তীকে আগের দিন যা যা ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়ে আমার অনুমান আর আশঙ্কাটা জানান দরকার বুঝেও বেশ কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে যুঝেই অবশ্য তাঁদের খোঁজে গিয়েছি।

মামাবাবু কি ভাবে ব্যাপারটা নেবেন সেটা খানিকটা অনুমান করতে পারি বলেই এই অনিচ্ছা। এত বড় গুরুতর ব্যাপারটাকে সম্ভবতঃ তিনি আমলই দেবেন না।

বঙ্কুবাবু নিরুদ্দেশ!—বলে মিথ্যে আতঙ্কের ভান করে হয়ত শেষ পর্যন্ত হেসেই উঠে বলবেন,—খ্যাটের লোভে আদিবাসীদের গ্রামেই হয়ত লুকিয়ে আছে। মহান্তী কাছে থাকলে তাঁরও সে পরিহাসে যোগ দেওয়াটা বেশ কল্পনা করতে পারি।

সত্যি কথা বলতে গেলে বঙ্কুবাবুকে নিয়ে এ রকম অস্থির হওয়াটা একটু যে হাস্যকর দেখায় তা আমিও বুঝি। সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক মত না জানলে তাঁকে নিয়ে দুর্ভাবনাটা আজগুবি মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

সমস্ত ব্যাপারটা তাই মামাবাবু আর মহান্তীকে না জানালে নয়।

তার পরেও যদি তাঁরা নির্বিকার থাকেন ত নাচার।

কিন্তু মামাবাবু বা মহান্তীর নাগাল পাওয়াই যে ভার।

তাঁরা লোধমা পাহাড় ছেড়ে যান নি এইটুকু খবর পেয়ে আমাদের নিজেদের ছাউনি, তারপর সরকার সাহেবের আস্তানা

তুজায়গায় খোঁজ করে শেষে যা জানলাম তাতে বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ করলাম। আব কোথাও নয়, নাগাপ্পার খাস তাঁবুতেই তাঁরা বিশেষ পরামর্শ-সভায় নাকি জড় হয়েছেন।

নাগাপ্পার তাঁবু শুনেই অবশ্য সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। আমার যা বলবার তার শ্রোতা হিসাবে নাগাপ্পাকে যে চাই না তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এখন আর উপায় কি। সময় আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। নাগাপ্পার তাঁবুর পরামর্শ-সভা থেকে কখন মামাবাবু বার হবেন তার জন্যে আর অপেক্ষা করা চলে না।

মরিয়া হয়ে নাগাপ্পার তাঁবুতেই তাই গিয়ে হানা দিলাম।

পরামর্শ-সভাটা যে অত্যন্ত গোপন ও জরুরী তা নাগাপ্পার বেয়ারার আচরণেই একটু বোঝা গেল। সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়েও সে একটু দরজা আটকাবার ভঙ্গিতেই বললে,—ওঁদের জরুরী মিটিং হচ্ছে আজ্ঞে। কারুর ঢুকতে মানা আছে।

জানি!—বলে বেয়ারাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে পর্দার দরজা ঠেলে নাগাপ্পার খাস তাঁবুতে ঢুকে পড়লাম।

ঢোকাটা যে অপ্রত্যাশিত আর অবাঞ্ছিত তা কয়েক জোড়া অপ্রসন্ন চোখের কোঁচকানো ভুরু দেখেই বুঝলাম। মহান্তীর তাকানটাও একটু যেন অস্বস্তির। শুধু মামাবাবুর দৃষ্টি নির্বিকার আর সহাস্য অভ্যর্থনা শুধু নাগাপ্পার মুখে।

আসুন! আসুন মিঃ হাজরা!—তাঁর নিজের তাঁবুতে সভা বসেছে বলেই যেন উদার গৃহস্বামীর ভূমিকা নিয়ে নাগাপ্পা বেয়ারাকে একটা বাড়তি চেয়ার আনবার হুকুম দিলেন।

আমি ইতিমধ্যে কামরার সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। শুধু মামাবাবু, মহান্তী, সরকার সাহেব আর নাগাপ্পা নয়, আর একটি নতুন মুখ সেখানে দেখলাম। আমাদেরই বয়সী রোগাটে একজন ইউরোপীয়ান। ফিকে বাদামী পাতলা চুল আর ফ্যাকাশে কোঁচকানো

মুখে কেমন একটু রুগ্নতার আভাস থাকলেও ইনি যে নাগাপ্পার বর্তমান অতিথি মহাবুয়াং-এর হাতি শিকারী তা তখন বুঝেছি।

বেয়ারার নিয়ে আসা ক্যানভাসের ফোল্ডিং চেয়ারটায় বসবার পর নাগাপ্পা পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় ইয়োরোপীয় শিকারীর নামটাও জানলাম—জন কার্সন।

এ সভার আলোচনার বেশ একটা উত্তেজনার মুহূর্তে উপদ্রবের মত যে এসে পড়েছি পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হবার আগেই বুঝলাম।

সরকার সাহেবই একটু অধৈর্যের সঙ্গে নাগাপ্পার দিকে চেয়ে বললেন, এসব লৌকিকতার যথেষ্ট সময় পরে পাওয়া যাবে মিঃ নাগাপ্পা। এখন মিঃ সেন যা বলছিলেন সেটার মীমাংসা আগে দরকার।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই!—বলে নাগাপ্পা যেন মাপ চাইবার ভাঙ্গ করলেন। কিন্তু তাঁর চোখের মধ্যে এক পলকের জন্যে যে চাপা আক্রোশের ঝিলিকটা খেলে গেল তা আর যারই হোক আমার দৃষ্টি এড়াল না।

মামাবাবু কিন্তু আগাগোড়া নির্বিকার। আমরা চুপ করতেই বই থেকে যেন মুখস্থ পড়ছেন এমনি ভাবে বললেন,—আমরা তাহলে দু ধরণের অদ্ভুত খেই এ রহস্যের পাচ্ছি। তার একটা এই খুনের ব্যাপারের সঙ্গে জড়ানো কিনা তাও আমরা কেউ জোর করে এখনো বলতে পারছি না। এ খেই কটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো বলা যেতে পারে। মিঃ সরকারই প্রথম এগুলো দৈবাৎ লক্ষ্য করেন। এ কাগজগুলোর ভেতর সাংঘাতিক কিছু লেখা টেখা পাওয়া যায় নি। যা দেখা গেছে তা পড়লে আজে বাজে কথা কেউ অন্যমনস্ক ভাবে এখানে সেখানে লিখেছে বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু মন দিয়ে পরীক্ষা করলে সন্দেহ হয় কথাগুলো একেবারে আবোল তাবোল নয়। যেমন এই কাগজের টুকরোটাই দেখা যাক।

সামনের টেবিলটার ওপর একটি ছোট খোলা বাক্সের মধ্যে রাখা ছেঁড়া দলা-পাকানো টুকরো কাগজগুলো আগেই চোখে পড়েছিল। মামাবাবু তা থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে খুলে ধরে বললেন,—এতে লেখা দেখছি, ইংরেজিতে 'সি. আর., ২৪নং ৫২,০১' তারপর নিচে এক জায়গায় বোলতার চাকের মত একটা ছবি আকা।

মামাবাবু ছবিটা আমাদের দেখিয়ে বললেন,—সব শুদ্ধ জড়িয়ে অর্থহীন খামখেয়ালী লেখা আর আঁকা বলে মনে হলেও এগুলির একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই আরেকটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো দেখলেই সে তাৎপর্যটা কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে। এ কাগজটায় লেখা দেখছি—'মেটাল বুলেটিন, ১৯৩৮, ৭৮নং আউন্স ৩৬ ডলার'।

এ লেখার 'মেটাল বুলেটিন ১৯৩৮'-এর মধ্যে ধোঁয়াটে কিছু নেই। তার পরের '৭৮নং আর আউন্স ৩৬ ডলার'-এরও একটু ভাবলেই মানে পাওয়া যায়। ৭৮নং কি? সেটা হল প্ল্যাটিনম্ ধাতুর অ্যাটমিক নম্বর। অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের বিলেতের মেটাল বুলেটিন থেকে প্ল্যাটিনম্ ধাতুর দর যে আউন্স পিছু ৩৬ ডলার তা টুকে রাখা হয়েছে। এই কাগজের টুকরোর পাঠোদ্ধারের পর আগেরটাও বুঝতে অসুবিধে হয় না। সি. আর. হ'ল ক্রোমিয়ম ধাতুর সিম্বল, তার অ্যাটমিক নম্বর হল চব্বিশ, আর অ্যাটমিক ওজন হল ৫২'০১। কিন্তু এ সবের সঙ্গে ওই বোলতার চাকের মত ছবিটা কেন আর কিসের?

ছবিটা ক্রোমিয়ম ও প্ল্যাটিনম যার মধ্যে পাওয়া যায়, নাম না করে সেই পাথরটা বোঝাবার জন্যে। ও পাথরের বৈজ্ঞানিক নাম হল পেরিডোটাইট। পৃথিবীর গভীর বুকে প্রচণ্ড উত্তাপ আর চাপে তৈরী হয়। রং খুব গাঢ় সবুজ বা কালো।

হেলাফেলার বলে যা মনে হয়েছে, তাঁর কুড়িয়ে আনা সেই ছেঁড়া কাগজের মধ্যে এত রহস্য পাওয়াটা যেন তাঁরই বাহাদুরী মনে করে সরকার সাহেব তখন উত্তেজিত। মামাবাবু একটু

থামতেই তাঁকে আবার উস্‌কে দিয়ে বললেন,—এসব কাগজে যা পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে তাহলে কি বোঝা উচিত ?

মামাবাবু যে ভাবে হাসলেন, তাতে সরকার সাহেবের এ উৎসাহে তিনি খুশি হয়েছেন বলেই মনে হল। হেসে তিনি বললেন,—বোঝা উচিত যে এখানে কেউ পেরিডোটাইট আর তার মধ্যে ক্রোমিয়ম ত বটেই এমন কি প্ল্যাটিনমেরও সন্ধান বোধ হয় পেয়েছে।

পাওয়াটা ত অপরাধ নয়।—নিজের কথাটা বলবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেও মামাবাবুদের এই নিরর্থক আলোচনায়ও মন্তব্যটুকু না করে পারলাম না।

পাওয়া অপরাধ নয়,—মামাবাবুর বদলে মহান্তীই হেসে জবাব দিলেন,—কিন্তু লুকিয়ে রাখাটা অপরাধ! এসব কাগজ দেখে মনে হয় কেউ এই রকম কিছু দামী খনিজের সন্ধান পেয়ে তা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে।

তাতে লাভ? অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম,—খনি ত আর চুরি করে পকেটে নিয়ে পালান যাবে না!

তা যাবে না! নাগাপ্পাই এবার আমাকে জ্ঞান দিলেন,—কিন্তু লুকিয়ে কিছু হাতিয়ে নিতে পারলে প্ল্যাটিনম-এর মত ধাতু বেচে বেশ কিছু লাভ করা যায়। তাছাড়া সরকারের কাছে যে সব কোম্পানী এসব খনি চালাবার অধিকার নেয় তাদের কাছ থেকেও গোপন খবর দেবার দরুন মোটা টাকা আদায় করা যেতে পারে।

শুধু তাই কেন!—মামাবাবুই বুঝিয়ে দিলেন এবার,—সেরকম ঠগ কোম্পানী হলে অন্য কিছুর নামে খনি চালিয়ে গোপনে এই দামী ধাতু পাচার করতে পারে। বেশী দিন তা পারা না গেলেও সেরকম চোরা দলের পক্ষে কিছুদিনের মধ্যেই যতখানি সম্ভব লুটে পুটে নিয়ে একেবারে হাওয়া হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু লোধমা পাহাড়ে যারা আছে,—নাগাপ্পা এবার একটু তীব্র

স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন—তাদের মধ্যে এ কাজ কারুর পক্ষে সম্ভব বলে ত ভাবতে পারছি না।

কয়েক মুহূর্ত সবাই একেবারে চুপ। মনের কথা কারুর যদি কিছু থাকে বলার দ্বিধা কেউ যেন কাটাতে পারছেন না।

দ্বিধা কাটালেন প্রথম সরকার সাহেব।

টেবিলের ওপর নাগাপ্পার কোম্পানীর একটা ছাপানো প্যাড পড়ে ছিল। তা থেকে হঠাৎ একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে নাগাপ্পাকে যেন চোখের দৃষ্টিতে গেঁথে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন,—এ প্যাড ত আপনার কোম্পানীর?

প্রশ্নটা আমাদেরও অর্থহীন বলে মনে হ'ল। কিন্তু নাগাপ্পা যেন তাতে জ্বলে উঠে কোন রকমে নিজেকে সামলে তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বললেন,—আপনি ত পড়তে জানেন। নামটা যখন ছাপাই আছে ওপরে তখন জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

জিজ্ঞাসা করছি এই কাগজটার জন্যে।—সরকার সাহেব আমাদের সকলকে কাগজটা দেখিয়ে বললেন,—আপনাদের কোম্পানীর কাগজ যেমন তেমন নয়, একটু বিশেষ ও উঁচু দরের কাগজ। আমি যত দূর জানি এ রকম কাগজের প্যাড লোধমা পাহাড়ে আর কেউ আমরা ব্যবহার করি না।

তাতে হ'ল কি?—নাগাপ্পার গলা এবার শান্ত। কিন্তু চোখ দুটো যেন ছুরির ফলা।

হয়েছে এই যে, এসব ছেঁড়া টুকরো আর আপনার প্যাডের কাগজ একই ব্র্যাণ্ডের। আপনারা মিলিয়ে দেখুন।

সরকার সাহেব ছেঁড়া কাগজের বাক্স আর প্যাডটা টেবিলের মাঝখানে ঠেলে দিলেন।

কেউ কিন্তু সঙ্কোচের দরুনই বোধহয় কাগজগুলো মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করল না।

নাগাপ্পাই সেগুলো নিজের কাছে টেনে নিয়ে হেসে উঠে

বললেন,—তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আমার এ প্যাড টেবিলের ওপর অফিস ঘরে পড়ে থাকে। যে কেউ তা চুরি করতে পারে।

তা হয়ত পারে।—সরকার সাহেব বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বললেন, কিন্তু আপনি যে কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে এখানে আছেন, তার কাজটা কি বলতে পারেন? কোম্পানীটা আসল না জাল তাই ত বোঝা যাচ্ছে না। আমি ত বড় বড় সব কটা ডিরেকটরী ঘেঁটে কোথাও আপনাদের কোম্পানীর নাম পাই নি।

ঘরের সবাই স্তম্ভিত বলে মনে হল। নাগাপ্পা কিন্তু এবার অবিচলিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি এত কষ্ট তাহলে করেছেন? কেন মিছে করতে গেলেন। তার বদলে আমায় জিজ্ঞাসা করলেই আমি বলে দিতাম আমাদের কোম্পানীর নামটা আসল নয়।

নাগাপ্পার কথায় প্রায় সবাই কিছুক্ষণ একেবারে নির্বাক।

নাগাপ্পা স্বীকার করছেন যে তাঁর কোম্পানীর নামটা জাল।

সরকার সাহেব প্রথমটা বেশ একটু হতভম্ব ভাবে নাগাপ্পার বক্তব্যটাই আবার আওড়ালেন,—আপনি বলছেন, আপনাদের কোম্পানীর নামটা আসল নয়? তার মানে মিথ্যে একটা কোম্পানীর নাম নিয়ে আপনি এখানে এতদিন ধরে আছেন!

কথা বলতে বলতে সরকার-সাহেবের গলা ও মেজাজ গরম হয়ে উঠল। রীতিমত তীব্রস্বরে তিনি জানতে চাইলেন,—আমাদের সকলের চোখে ধূলো দিয়ে আপনি কী মতলব এখানে হাসিল করছেন? শুধু নিজের মুখে স্বীকার করেই ঠগবাজির দোষ আপনি কাটাবেন ভাবছেন?

ধীরে, বন্ধু ধীরে!

নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করেও নাগাপ্পা প্রায় নির্বিকার ভাবে একটু হেসে ইংরেজীতে যা জবাব দিলেন তার বাংলাটা ওই রকমই দাঁড়ায়।

সরকার সাহেব উত্তেজিতভাবে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নাগাপ্পা একটু কৌতুকের স্বরেই বললেন,—এক দৌড়ে অতখানি যাবেন না! আমার কোম্পানীর নামটা আসল নয় বলে কি আমি ঠগবাজ হয়ে গেছি? আমাদের কোম্পানীর আগের নাম হল ভ্যলকান মিনারেলস্ লিমিটেড। বিদেশের কোম্পানী, ভারতবর্ষে এসে এখানকার অংশীদার নিয়ে নতুন করে গড়া হচ্ছে। এখন নাম হবে ইণ্ডো ভ্যলকান মিনারেলস্ লিমিটেড। সে নামটা কিছুদিনের মধ্যেই রেজেষ্ট্রী হয়ে যাবে, নিয়ম কানুনের ফ্যাকড়ায় একটু দেরি হচ্ছে। এই সময়টায় পুরোনো নামে জরিপ টরিপের প্রাথমিক কাজ চালিয়ে যাবার অনুমতি আমরা পেয়েছি। আমাদের আগের ও এখনকার দুটো নামের কোনটাই ডিরেক্টরীতে না পাওয়ার কারণ এই।

এত ফলাও করে দেওয়া সত্ত্বেও নাগাপ্পার ব্যাখ্যাটা বেশ কাঁচাই মনে হল। মুখে নির্বিকার ভাব দেখালেও এমন বিস্তারিত ভাবে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টাটাই যেন একটু অস্বাভাবিক।

আচমকা ধরা পড়ে নাগাপ্পার এই সাফাই গাইবার দুর্বল চেষ্টায় মামাবাবুর মুখে পর্যন্ত সামান্য অধৈর্য ফুটতে দেখলাম।

এসব কৈফিয়ৎ কেন দিচ্ছেন মিঃ নাগাপ্পা?—মামাবাবু একটু রুক্ষ স্বরেই বললেন,—আপনার কথা যাচাই করবার এখন ত উপায় নেই। সুতরাং কাগজগুলো আপনার প্যাড থেকেই ছেঁড়া বলে ধরে নিয়ে তার কোন হদিস পাওয়া যায় কি না দেখা যাক্।

আমি একটা প্রস্তাব করতে পারি?

বেশ একটু অবাক হয়ে নাগাপ্পার শিকারী বিদেশী বন্ধু মিঃ কার্সনের দিকে তাকালাম। এতক্ষণ বাদে এই প্রথম তিনি মুখ খুললেন।

নিশ্চয়ই পারেন!—মহান্তীই তাঁকে উৎসাহ দিলেন।

কয়েক মুহূর্ত একটু যেন দ্বিধাভরে আমাদের সকলের মুখের

ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কার্সন বললেন—ওই কাগজের টুকরোগুলোতে যা লেখা আছে যার তার পক্ষে তা লেখা নিশ্চয় সম্ভব নয়?

না, তা ত নয়ই।—সরকার সাহেবই সায় দিলেন,—ওয়াকি-বহাল ওপরওয়ালা বিশেষজ্ঞ কেউ ছাড়া বিজ্ঞান ও ব্যবসার এসব সাঙ্কেতিক খুঁটিনাটি জানে কে? এসব লেখার স্বার্থও নেই অন্য কারুর।

তাহলে,—একটু থেমে আবার যেন একটু অস্বস্তি জোর করে জয় করে মিঃ কার্সন বললেন,—ও লেখাগুলো এখানে যাঁরা উপস্থিত তাঁদের কারুরই হবে নিশ্চয়।

হঠাৎ সবাই যেন হকচকিয়ে গেলাম প্রথম কথাটা শুনে। তারপর সকলেই বোধহয় বুঝলেন যে কার্সন অন্যায় কিছু বলেন নি। মামাবাবু ত স্পষ্টই কার্সনকে সমর্থন করলেন।

হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন মিঃ কার্সন। লোধমা পাহাড়ে যে কটি কোম্পানী আছে, তার সব কর্তা ব্যক্তিই এখানে হাজির। এঁরা ছাড়া আর কে ওসব লিখতে পারে? লেখার গরজই বা কিসের?

তাই,—মামাবাবুর সমর্থন পেয়ে কার্সন এবার একটু জোর দিয়েই বললেন,—আমি একটা অতি সহজ পরীক্ষায় আপনাদের রাজী হতে অনুরোধ করি।

কি পরীক্ষা?—বন্ধু হলেও নাগাপ্পা সন্দিগ্ধভাবে কার্সনের দিকে চাইলেন।

পরীক্ষা আর কিছু নয়,—কার্সন সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন—ওই ছেঁড়া কাগজগুলোয় যা লেখা আছে এখানকার প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে তা লিখবেন।

ও!—নাগাপ্পাই একটু বিদ্রূপের হাসি হাসলেন,—তুমি হাতের লেখা মিলিয়ে দোষী ধরবে? হাতের লেখা মিলবে বলে তোমার ধারণা?

একেবারে হুবহু হয়ত মিলবে না।—কার্সন একটু হেসে জানালেন,—কিন্তু চেষ্টা করলেও হাতের লেখা একেবারে লুকোন যায় না। কয়েকটা খোঁচ আর টানের ইশারা থেকে যায়ই। সুতরাং কারুর লেখার ধাঁচের সঙ্গে মিল পাবই বলে আশা করছি।

আপনি তাহলে শুধু শিকারী নয়, হ্যাণ্ড রাইটিং এক্সপার্ট। হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ!—সরকার সাহেবের গলায় স্পষ্টই উপহাসের সুর শোনা গেল।

কার্সন সে উপহাস গায়ে না মেখে বিনীতভাবেই জানালেন যে ঠিক বিশেষজ্ঞ না হলেও এ বিদ্যার চর্চা তিনি সৌখিনভাবে কিছু করেছেন।

এর পর আর কথা না বাড়িয়ে সবাই নাগাপ্পার কোম্পানীর প্যাডের কাগজেই ছেঁড়া কাগজের টুকরোর লেখাগুলো আলাদা আলাদা লিখলেন। মামাবাবু আর আমিও বাদ গেলাম না। লেখবার ত বেশী কিছু নেই, সামান্য কয়েকটা কথা আর গোটাকতক সংখ্যা মাত্র। সকলের লেখা হবার পর কার্সন কাগজগুলো যেরকম উত্তেজিত আগ্রহভরে কাছে টেনে নিলেন তাতে মনে হল লোধমা পাহাড়ের রহস্যের একটা খেই ধরা পড়তে বুঝি আর দেরি নেই!

কিন্তু বৃথা আশা! ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলোর সঙ্গে আমাদের লেখা কাগজগুলো মিলিয়ে দেখতে দেখতে মিনিট দশেক পরে কার্সনের ভ্রূকুঞ্চন দেখেই সন্দেহ হল তিনি তাঁর বিদ্যেতে আর থই পাচ্ছেন না।

কি বুঝছেন মিঃ কার্সন?—মহান্তী ঠাট্টা করে বললেন,—দুশমন কে, তা ধরতে পারলেন?

না।—কার্সন দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়লেন।

কারুর লেখার সঙ্গেই মিল খুঁজে পাচ্ছেন না বুঝি?—মামাবাবু হেসে প্রশ্ন করলেন।

না, তা একটু পাচ্ছি।—কার্সনকে বেশ কুণ্ঠিত মনে হল।

মিল পাচ্ছেন !

আমরা সবাই চঞ্চল আর উদগ্রীব হয়ে উঠলাম।

তাহলে অমন হতাশভাব দেখাচ্ছেন কেন ?—আমিই খোঁচা দিয়ে বললাম,—দুশমন ত তাহলে ধরেই ফেলেছেন !

না, তা ধরা যাচ্ছে না।—কার্সন বেশ একটু সঙ্কুচিতভাবে জানালেন,—কারণ লেখাটা একটু যা মিলছে তা মিঃ নাগাপ্পার সঙ্গে।

খানিকক্ষণ ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। যার যা বলবার যেন গলায় আটকে যাচ্ছে।

তার মানে ?—মামাবাবুই প্রথম এ আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠে বললেন,—মিঃ নাগাপ্পার লেখার সঙ্গে মিলছে, অথচ বন্ধু বলে তাঁকে দোষী ভাবতে আপনার আটকাচ্ছে ?

না, না ঠিক তা নয়।—কার্সন বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

ঠিক তা নয় কেন বলছেন ! ব্যাপারটা ঠিক তাই।—মামাবাবু একটু হেসে বললেন,—কিন্তু নাগাপ্পা আপনার বন্ধু বলেই নির্দোষ হবেন এটা ঠিক উচিত কথা ত নয়।

না, মানে আমি বলতে চাইছি যে—কার্সন বেশ একটু ফাঁপরে পড়ে তাঁর বক্তব্য গুলিয়ে ফেললেন,—সামান্য মিল যা পেয়েছি তার ওপর নির্ভর করে সঠিক কিছু বলা যায় না।

কিন্তু মিল যেটুকু পেয়েছেন তা মিঃ নাগাপ্পার লেখার সঙ্গেই এটুকু ত স্বীকার করছেন ?—সরকার সাহেব কার্সনকেই যেন আসামী খাড়া করলেন তাঁর জবরদস্ত জেরার ধরনে।

কার্সন কোনো জবাব দেবার আগে মামাবাবু এবার বাধা দিয়ে একটু দৃঢ়স্বরে বললেন,—মিঃ কার্সনের কথা আমরা শুনেছি, এখন মিঃ নাগাপ্পার নিজের এ বিষয়ে কিছু বলার আছে কি না সেটাই আগে আমাদের বোধ হয় জানা দরকার।

এইটুকু শুধু বলার আছে যে,—বাঁকা বিদ্রূপের স্বরে বললেন নাগাপ্পা,—জন কার্সন আমার বন্ধু। কিন্তু বড় শিকারী হলেও 'হস্তলিপি বিশারদ' বলে ওর পরিচয় আমার জানা ছিল না। সে পরিচয় দিতে গিয়ে ওর এমন দুরবস্থা না হলে খুশী হতাম।

তার মানে আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রইলাম বলতে চান?—সরকার সাহেব নিজের বিরক্তিটা না লুকিয়েই বললেন,—এতটা সময় আমাদের বৃথাই নষ্ট হল!

আমি অত্যন্ত দুঃখিত!—কার্সন সকলের কাছে মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গিতে আরো কিছু বোধহয় বলতে যাচ্ছিলেন! নাগাপ্পা তাতে বাধা দিয়ে বললেন,—না, দুঃখিত হবার তোমার কিছু নেই জন! সময়টা আমাদের বৃথা নষ্ট হয়েছে বলে মনে করব কেন? দুটো অত্যন্ত দামী আবিষ্কার ত এঁরা করে ফেলেছেন। একটা হল এই যে মিঃ সরকারের কুড়িয়ে পাওয়া কাগজের টুকরোগুলো আমার কোম্পানীর প্যাড থেকেই ছেঁড়া বলে ধরা যেতে পারে, কারণ দুটোই এক ব্র্যাণ্ডের কাগজ। দ্বিতীয়টা হল ছেঁড়া কাগজের লেখার সঙ্গে আমার হাতের লেখার মিল। এ দুটো গুরুতর আবিষ্কারের পর আমার সম্বন্ধে আরো নতুন কি বেরিয়ে পড়তে পারে কে জানে? আমি ত সেই অপেক্ষাতেই আছি।

কথাগুলোয় নাগাপ্পার তাচ্ছিল্য আর উপহাসের সুরটাই আমার সবচেয়ে খারাপ লাগল! সুযোগটা যখন নাগাপ্পা নিজেই করে দিয়েছেন তখন আর নিজেকে সামলাবার দরকার বোধ করলাম না!

নাগাপ্পার সঙ্গেই প্রায় সুর মিলিয়ে বললাম,—অপেক্ষা আপনার বৃথা হবে না মিঃ নাগাপ্পা। আপনার সম্বন্ধে আরো ক'টা আবিষ্কারের কথা আমিই জানাচ্ছি।

নয়

আমার কথায় নাগাপ্পার চমকে ওঠাটা স্পষ্টই টের পেলাম। অন্য সকলেও তখন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে।

কি আবিষ্কার?—মামাবাবুই একটু যেন চড়া গলায় প্রশ্ন করলেন।

প্রথম আবিষ্কার এই যে সবাই যখন এখানকার নিষেধ মেনে লোধমা পাহাড় থেকে নামা বন্ধ করেছে নাগাপ্পা তখন লোধমা পাহাড় ছেড়ে ত গেছেনই আদিবাসীদের নিষিদ্ধ এঞ্জা পাহাড়েও গোপনে উঠেছেন।

আর সকলে তখন চুপ। আমার দিকে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে চেয়ে নাগাপ্পা শুধু বললেন,—তারপর দ্বিতীয় আবিষ্কার?

দ্বিতীয় আবিষ্কার হল, আদিবাসী পিয়ন যেখানে খুন হয়েছে আপনার লুকিয়ে সেখানে গিয়ে খুনের প্রমাণ সরিয়ে ফেলা।

কি বলছ কি হাজরা!—মহান্তীর রুক্ষস্বরে মনে হল আমার মাথা ঠিক আছে কিনা তাই যেন তাঁর সন্দেহ হচ্ছে।

নাগাপ্পা তখনো কিন্তু স্থির অবিচলিত ঈষৎ ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দিকেই ফিরে বললাম,—বলুন মিঃ নাগাপ্পা আমার আবিষ্কারগুলো মিথ্যে কি না।

তার মানে,—আমার দিকে চেয়ে যেন অবিশ্বাসের সুরে বললেন নাগাপ্পা,—আপনি ও পাহাড়ে তখন ছিলেন?

হ্যাঁ ছিলাম! আর খুনের জায়গা থেকে পাথুরে মাটি চেঁছে কিছু যে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাও দেখেছি। সে জিনিসটা কি এবার বলবেন?

বলব কেন,—আমার এতক্ষণের অভিযোগের যেন কোনো

দামই না দিয়ে নাগাপ্পা উঠে পড়ে বললেন,—সে জিনিসটা দেখিয়েই দিচ্ছি।

নাগাপ্পা সত্যিই তাঁবু ঘরের একটা দেরাজ থেকে একটা কাগজের মোড়ক এনে সামনের টেবিলের ওপর খুলে ধরে বললেন—এই হল সেই জিনিস। জিনিসটা কি আপনারা কেউ বুঝতে পারছেন কি?

সকলেই বিস্মিত কৌতূহলে কাগজের মোড়কের জিনিসটা দেখতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সব চেয়ে হতভম্ব তখন আমি। আমার অভিযোগ অস্বীকার না করে, নাগাপ্পা যে তা খেলো আর ভোঁতা করে দেবার অমন একটা প্যাঁচ কষবেন তা ভাবতে পারিনি।

জিনিসটা ত কোনো জন্তুর বিষ্ঠা বলে মনে হচ্ছে।—প্রথম মন্তব্য করলেন মহান্তী।

ঠিকই ধরেছেন।—নাগাপ্পা সায় দিয়ে জানালেন,—কিন্তু কোন্ জানোয়ারের তা বুঝেছেন কি?

মামাবাবু এ সভায় বেশীর ভাগ একটু অস্বাভাবিকরকম নীরব হয়েই আছেন। এইবার একটু মুচকে হেসে বললেন,—কোন্ জানোয়ারের? হাতির?

হ্যাঁ ঠিক তাই!—নাগাপ্পা যেন একটা তর্কে জেতার ভঙ্গিতে বললেন,—হাতের লেখা সম্বন্ধে না হোক, এ ব্যাপারে আমার বন্ধু জন কার্সনের মতামতের ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি। জন-কে কালই আমি এ জিনিসটা দেখিয়েছি। ওর নিজের মুখেই ওর মতটা শুনুন।

হ্যাঁ,—কার্সন স্বীকার করলেন,—কালই আমি এটা পরীক্ষা করেছি। এটা যে হাতির বিষ্ঠা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু হাতির বিষ্ঠাই যদি হয় তাহলে আদিবাসী পিয়নের খুনের রহস্যটা প্রায় ভৌতিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে।—মামাবাবু চিন্তিতভাবে

বললেন, মিঃ কার্সনের কথায় জানছি মহাবুয়াং-এর ক্ষ্যাপা হাতিটার পক্ষে সেদিন এ অঞ্চলে আসা অসম্ভব। পিয়নের খুনের জায়গায় তাহলে এ আবার কোন্ হাতি কোথা থেকে এল?

যেখান থেকেই আসুক—সরকার সাহেব যুক্তির সামনে খানিকটা যেন নিরুপায় হয়েই স্বীকার করলেন,—বিষ্ঠা যখন পাওয়া গেছে তখন হাতি একটা নিশ্চয় ওখানে এসেছিল।

তাহলে আবার ত সব ধারণা পাল্টাতে হয়।—মহান্তী বেশ দ্বিধার সঙ্গে বললেন,—পিয়নটিকে যদি কোনো ক্ষ্যাপা হাতি মেরে থাকে, তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার কিছু ত নেই।

একটু আছে।—মামাবাবু ফ্যাঁকড়া তুললেন, হাতির বিষ্ঠা ঠিক ওই জায়গায় পাওয়া গেছে কি না সে বিষয়ে একটা সন্দেহ উঠতে পারে।

সে সন্দেহের বিরুদ্ধে আপনার ভাগ্নে মিঃ হাজরাই ত আমার সাক্ষী!—নাগাপ্পা এক কথায় মামাবাবুকে চুপ করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে আমাকেও হতভম্ব করে দিলেন। যা আমার অভিযোগ তাই সাক্ষ্য হিসেবে নিজের কাজে লাগান-টা নাগাপ্পার শয়তানী বাহাদুরীর চূড়ান্ত বলে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম।

কিন্তু ওই প্যাঁচটুকুতেই হার মানবার পাত্র আমি নই। নাগাপ্পাকে যেন সমর্থন করেই বললাম,—হ্যাঁ শুধু ওই একটা ব্যাপারে কেন, আমি আপনার আরেকটা বাহাদুরীরও সাক্ষী। পাছে কেউ আপনার লুকিয়ে ওখানে ঘোরা দেখে ফেলে সেই ভয়ে আপনার বেপরোয়া গুলি ছোড়াও আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর একটু হলে তার শিকারও হতাম।

কামরার মাঝখানে একটা বোমা ফাটাবার মত খবরই ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু ফলটা যা আশা করেছিলাম তা পুরোপুরি পেলাম না।

নাগাপ্পাই বোমাটাকে কেমন যেন কাঁচিয়ে দিলেন, দিলেন অতি সস্তা একটি প্যাঁচে।

আমার মুখে নাগাপ্পার সেই নির্জন পাহাড়ী প্রান্তরে বেপরোয়া গুলি ছোড়ার খবর শুনে আর সকলে রীতিমত হতভম্বই হয়ে যাচ্ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু নাগাপ্পা হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে ওঠায় হাওয়াটা একেবারে হালকা হয়ে গেল।

তাহলে ত খুব মজার নাটক হয়েছিল,—নাগাপ্পা হাসতে হাসতেই বললেন, আপনার হাত পা নিশ্চয়ই তখন ভয়ে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছল! অজ্ঞান টজ্ঞান হয়ে যান নি ত?

কথাগুলো বলার ধরনে অনেকের মুখেই তখন কৌতুকের হাসির রেখা একটু ফুটে উঠেছে। হাসি তামাসার সুরটা কাটাবার জন্যে যতদূর সম্ভব গম্ভীর ও কড়া গলায় বললাম,—ব্যাপারটা ঠাট্টার নয় মিঃ নাগাপ্পা। ও গুলিতে একটা খুন জখমও হতে পারত।

হলে সেটা ভৌতিক ব্যাপার হত!—নাগাপ্পা আগের মতই হাসতে হাসতে বললেন,—কারণ পিস্তলে আসলে গুলি ত ছিল না। ফাঁকা আওয়াজ করেছিলাম মাত্র।

ফাঁকা আওয়াজ করেছিলেন!—কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম শুধু এ মিথ্যের প্রতিবাদ করবার কোনো উপায় নেই বুঝে। ফাঁকা আওয়াজ করেছিলেন না সত্যিই গুলি ছুড়েছিলেন তা এখন কেমন করে প্রমাণ হবে? নিরুপায় হয়ে নাগাপ্পার কথাটাই যেন মেনে নিয়ে তারপর গলাটা সমান রুক্ষ রেখেই জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু ফাঁকা আওয়াজই বা কেন করলেন বলতে পারেন?

কেন আর!—নাগাপ্পা যেন আমার বুদ্ধির অভাবে অবাক,—ভয় দেখাবার জন্যে!

কাকে?—এবার তীক্ষ্ণ প্রশ্নটা সরকার সাহেবের।

ফাঁকা আওয়াজে ভয় পাওয়ানো যায় এমন কাউকে! মুখে বিদ্রূপের হাসি থাকলেও এবার উত্তরটা দিতে নাগাপ্পার যেন দু এক

মুহূর্তের দ্বিধা দেখলাম,—জায়গাটা ত ভালো নয়। বুনো হাতির ত তখনই চিহ্ন পেয়েছি, তা ছাড়া ভালুক কি চিতারও অভাব নেই। যেখানে বসে ছিলাম তার কিছু দূরে কয়েকটা ঝোপ-ঝাড় পাথুরে ঢিবির পেছনে কি রকম একটা শব্দ যেন শুনতে পাই। সাবধানের মার নেই। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে তাই দুটো ফাঁকা আওয়াজ করি। তেমন কোন জানোয়ার থাকলে বেরিয়ে পড়ে ভয়ে ছুটে পালাবে।

জানোয়ার ত কিছু বার হয়নি?—সরকার সাহেবই স্পষ্ট সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নাগাপ্পার দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

তা ত হয়ই নি! নাগাপ্পা এবার একটু বিরক্তির সঙ্গেই উত্তর দিলেন,—আর হয়নি বলেই ফিরে নিজের কাজে চলে যাই। ওখানে যে মিঃ হাজরা লুকিয়ে বসে আছেন তা ত তখন কল্পনাই করতে পারিনি।

বলতে যাচ্ছিলাম যে, শুধু মিঃ হাজরা নয়, আরো একজন তার সঙ্গে সেখানে বসে তাঁর কীর্তিকলাপ সব দেখেছে। কিন্তু খুব সময়মত নিজেকে সামলে গেলাম। সত্যিই নাগাপ্পাকে এভাবে জেরা করে কোনো লাভ নেই।

সোজাসুজি তাঁকে মুঠোয় ধরতে গেলে পিছল পাঁকাল মাছের মত কিরকম হড়কে তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন তা ত ভালো করেই দেখলাম। তাঁর শয়তানী প্রমাণ করবার জন্যে আরো তোড়জোড় ও কৌশল দরকার। প্রমাণের বেড়াজাল এমনভাবে তাঁর চারিদিক থেকে গুটোতে হবে যাতে পালাবার রাস্তা আর তিনি না পান।

মামাবাবুও সেই কথাই বুঝে নিশ্চয়ই এতক্ষণে একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন,—এ আলোচনা আর চালিয়ে কোনো লাভ আছে বলে ত মনে হচ্ছে না। যা যা সূত্র আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি সেগুলো নিয়ে সবাই আজকের দিনটা আমরা ভালো করে ভেবে দেখি। কাল সকালে আবার আমরা একসঙ্গে বসব। এবার

বৈঠকটা আমাদের মহান্তীর ছাউনিতেই হবে। ইতিমধ্যে এ রহস্যের নতুন কোন সূত্র আর সমাধানের মালমশলা হয়ত আমাদের হাতে আসতে পারে।

সেইরকম মালমশলাই মামাবাবুর হাতে তুলে দেবার সঙ্কল্প করে নাগাপ্পার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম।

তাঁবু থেকে বার হবার সময় নাগাপ্পার নির্লজ্জ অন্তরঙ্গতার চেষ্টায় বেশ একটু অবাক হতে হল। আর সকলের সঙ্গে তাঁবুঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেও তখন একলাই আলাদা রাস্তায় চলেছি। যতক্ষণ এ সভায় ছিলাম সেই সময়ের মধ্যে বঙ্কুবাবু ফিরে এসেছেন কি না খোঁজ নেওয়ার জন্যে সরকার সাহেবের তাঁবু আর ক্যান্টিনটা ঘুরে যাওয়াই উদ্দেশ্য।

কয়েক পা যেতে না যেতেই হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনে চমকে দাঁড়াতে হল। ডাকছেন আর কেউ নয় স্বয়ং নাগাপ্পা।

আমার মুখের ভ্রূকুটিটা তখন খুব অস্পষ্ট নয়। কিন্তু নাগাপ্পা সেটা যেন লক্ষ্যই না করে পরম আপ্যায়নের হাসি হেসে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন,—ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? ক্যান্টিনে? নাই গেলেন আর। লাঞ্চটা আজ আমার এখানেই সারুন না!

না, ধন্যবাদ!—ভদ্রতার হাসির ভানটুকু পর্যন্ত না করে জবাব দিলাম।

কিন্তু জন কয়েকটা ভালো টিনের খাবার এনেছে। নাগাপ্পা তবু খাবারের ঘুষ দিয়ে জপাবার চেষ্টা করলেন,—ক্যান্টিনের সেই ত একঘেয়ে খানা! একটু মুখ বদলে যান না!

না, আমার এখন অন্য কাজ আছে। বেশ রুক্ষভাবেই জানিয়ে এবার সোজা বেরিয়ে চলে গেলাম। নাগাপ্পার মুখের চেহারাটা এ জবাবে কিরকম হল, লোভ হওয়া সত্ত্বেও একবার ফিরেও দেখলাম না।

যেতে যেতে নাগাপ্পার এই নির্লজ্জ আপ্যায়নের কারণটা বোঝবার চেষ্টা করছিলাম।

আমাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করে কি মতলব সে হাসিল করতে চায়?

আমি যে তার গোপন গতিবিধি জেনে ফেলেছি সে সম্বন্ধে ত আর কোন প্রশ্নই নেই। সকলের কাছেই তা আমি প্রকাশ

করেছি। এরপর জানাটা আমার কতদূর, যেটুকু বলেছি তা বাদে আরো কিছু আমি হাতে রেখেছি কি না তাই বার করাই কি তার উদ্দেশ্য?

শুধু লাঞ্চ খাইয়েই কি তা সে বার করবার আশা রাখে? আর বার করতে পারলেও তাতে তার লাভ কি হবে কিছু?

আমার মুখ ত তাকে বন্ধ করতে হবে! কেমন করে তা সে করবে ভেবেছিল? লাঞ্চের টিনের খাবারের চেয়ে আরো বড় কোনো ঘুষের ব্যবস্থায়?

একবার এমনও মনে হচ্ছিল যে, নাগাপ্পার লাঞ্চের নিমন্ত্রণটা নিলেও মন্দ হত না। বেকায়দায় পড়ে কি চাল সে চালে তা অন্ততঃ জানা যেত।

কিন্তু নাগাপ্পা কি এমন সোজা লোক যে তার সব প্যাঁচ আমি এত সহজেই ধরে ফেলতাম।

সে একেবারে পাকা ঘুঘু। উদ্দেশ্যটা, তার যত স্পষ্টই হোক তা সফল করবার জন্যে সামনাসামনি ঘুষ দেবার মত এমন একটা মোটা চাল সে চালবে না।

লাঞ্চটা সুতরাং তার মতলব হাসিলের একটা নির্দোষ ভূমিকা মাত্র। সে ভূমিকা থেকে তার গোপন চাল ধরবার আশা করাই ভুল। লাঞ্চের নিমন্ত্রণ না নিয়ে খুব লোকসান তাই হয় নি।

কিন্তু এখন আমার কি করা উচিত?

সরকারসাহেবের তাঁবু আর ক্যান্টিন, দুজায়গাতেই খোঁজ নিয়ে বঙ্কুবাবু এখনো ফেরেন নি জানবারপর সেইটেই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

নাগাপ্পার তাঁবুঘরের সভায় বঙ্কুবাবুর কথাটা শেষ পর্যন্ত চেপেই গিয়েছিলাম। ভালোই করেছিলাম এ বিষয়ে আমার নিজের কোন সন্দেহ নেই। তার গোপন গতিবিধির সাক্ষী যে একজন নয় দুজন, এখবরটা অন্ততঃ নাগাপ্পা এখনো জানতে পারে নি।

কিন্তু বঙ্কুবাবুর নিরুদ্দেশ হওয়ায় ব্যাপারটা আর ত শুধু নিজের কাছে চেপে রাখা উচিত নয়!

বঙ্কুবাবুর যদি গুরুতর কিছু হয়ে থাকে তাহলে তার জন্যে নিজেকে অনেকখানি দায়ী না করে যে পারব না!

সাঙ্ঘাতিক কিছু যদি নাও হয়ে থাকে তাহলেও অস্বাভাবিক কিছু যে ঘটেছে এ বিষয়ে ত সন্দেহ নেই। ওরকম একটা ভোজন-রসিক বোকা-সোকা ভালো মানুষ সখ করে পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ ত আর বিশ্বাস করবার নয়।

কি যে বঙ্কুবাবুর হতে পারে তা নিয়ে নিজের মনে জল্পনা কল্পনা করতেও যেন ভয় করে।

আর যাই হোক আনাড়ি নতুন লোক ত নন যে পাহাড়-জঙ্গলের রাস্তা ভুল করে পথ হারিয়ে বসে থাকবেন! বরং এ সব অঞ্চলের পথঘাট তাঁর অন্য অনেকের চেয়ে ঢের বেশী মুখস্থ। আদিবাসীদের পাহাড়ের অজানা পাকদণ্ডীর রাস্তায় তিনিই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

তাঁর এক দিন এক রাত না ফেরার কারণ তাহলে ত দুর্ঘটনা বলে ধরতে হয়। পাকদণ্ডীর পথে কোথাও বেকায়দায় পড়ে-টড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে আছেন? না দুর্ঘটনাটা তার চেয়ে বেশী গুরুতর? কোনো হিংস্র প্রাণী, মানে সেই বুনো হাতিটাই……

এর বেশী আর ভাববার চেষ্টা করিনি।

মনে মনে তখনই সঙ্কল্প স্থির করে নিয়ে সোজা লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেটের ছাউনিতে গিয়ে ঢুকলাম।

দশ

খাস তাঁবুঘরে মামাবাবু আর মহান্তী তখন লাঞ্চ খেতে বসেছেন।

তাঁদের সঙ্গে সরকারসাহেবও হয়ত জুটে গেছেন ভেবে যে ভয়টা পেয়েছিলাম তা অমূলক। ভাগ্য ভালো যে সরকার সাহেব এ বেলায় নিজের তাঁবুতেই খাওয়া সারতে গেছেন।

আমায় দেখে মহান্তী অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—কোথায় ছিলে তুমি হাজরা! আমরা ত কতক্ষণ অপেক্ষা করে এই খেতে বসছি!

মামাবাবু একটু হেসে বললেন,—লোধমা পাহাড়ের যা সব গোলমেলে ব্যাপার, তোর জন্যে তল্লাশী পার্টি পাঠাব কি না ভাবছিলাম।

আমার জন্যে নয়, সার্চ পার্টি সত্যিই পাঠান দরকার। খাবার টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসে জোর দিয়ে বললাম,—আর এখ্খুনই।

কার জন্যে!—মহান্তী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

আচ্ছা, যার জন্যেই হোক সে পাঠান যাবেখ'ন। মামাবাবু কথাটাকে আমলই না দিয়ে যেন ছেলেমানুষকে প্রবোধ দেবার ভঙ্গিতে বললেন,—তুই এখন খেতে বোস দেখি!

না, খেতে বসতে পারব না!—সত্যিই অস্থির হয়ে উঠলাম—আমায় যখন আরাম করে খেতে বসতে বলছ তখন একটা লোক কত বড় সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে যে পড়েছে তা ভাবতেও পারছি না। এখনও বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে!

কার কথা বলছিস?—মামাবাবুর মুখে সে তাচ্ছিল্যের ভাব আর নেই।

বলছি বঙ্কুবাবুর কথা।—তীক্ষ্ণস্বরেই জানালাম।

বঙ্কুবাবু! বঙ্কুবাবুর কথা বলছিস!

মামাবাবু যেভাবে নামটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে উচ্চারণ করলেন তাতে তিনি যে রীতিমত বিচলিত হয়েছেন তা স্পষ্টই বোঝা গেল। তাঁর টনক এতক্ষণে নড়াতে পেরেছি জেনে খুশি হলাম।

কি হয়েছে বঙ্কুবাবুর? মহান্তী একটু বিমূঢ়ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন।

আজ-দুদিন ধরে তিনি লোধমা পাহাড়ে ফেরেন নি।—বলে সেদিন সকালে আদিবাসীদের পাহাড়ে আমাদের অভিযানটার প্রায় পুরোপুরি বিবরণই দিলাম।

মামাবাবু আর মহান্তী দুজনেই অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তিতমুখে সমস্ত বিবরণ শুনলেন।

মামাবাবুর প্রথম মন্তব্যটা বেশ একটু তীক্ষ্ণই শোনাল তারপর। অভিযোগটা যেন আমার বিরুদ্ধেই—এসব কথা আগে বলিস নি কেন?

তোমায় পাচ্ছি কোথায় যে বলব! আমিও অভিমানটা প্রকাশ করলাম,—তাছাড়া নাগাপ্পার ওখানে এ কথা জানাতেই ত গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে যা দেখলাম শুনলাম তাতে এ কথাটা চেপে যাওয়াটাই ঠিক হয়েছে মনে হচ্ছে।

হুঁ! স্পষ্ট কোনো উত্তর না দিয়ে মামাবাবু তখন তন্ময় হয়ে আর একটা কি যেন ভাবতে ভাবতে উঠে পড়েছেন।

আমি যে হাজির আছি তা যেন ভুলেই গিয়ে মামাবাবু মহান্তীকে তাড়া লাগিয়ে বললেন,—নাও মহান্তী তাড়াতাড়ি তৈরী হও। এখুনি বেরুতে হবে। নাগাপ্পার শুধু একবার খোঁজ নাও।

নাগাপ্পার খোঁজ আবার কেন?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার দরকার হল না।

নাগাপ্পার সেই হেডবেয়ারা একটা চিঠি নিয়ে তখন সেলাম দিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

চিঠিটা তার হাত থেকে নিয়ে খুলে পড়তে পড়তে মামাবাবুর মুখের চেহারা যা দেখলাম তাতেই চিঠিটায় গুরুতর কিছু আছে বলে সন্দেহ হল।

সে সন্দেহ আরো দৃঢ় হল নাগাপ্পার বেয়ারা চলে যাবার পর মামাবাবুর উত্তেজনাটুকু দেখে।

মস্ত বড় একটা ভুল করে ফেলেছি মহান্তী! নাগাপ্পার চিঠিটা মহান্তীর হাতে দিয়ে মামাবাবু যেন বেশ একটু অস্থির যন্ত্রণার সঙ্গে বললেন,—এই একটা ভুলের জন্যে আমাদের এত সব চেষ্টা বানচাল হয়ে গিয়ে সাংঘাতিক একটা সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। চলো আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়।

আমাকে দুজনে মিলেই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করায় সত্যিই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম,—কিন্তু ব্যাপারটা কি! কি লিখেছেন নাগাপ্পা তা আমি জানতে পারি না?

নিশ্চয়ই পারো! মহান্তী চিঠির চিরকুটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন,—আজ সন্ধ্যায় নাগাপ্পার আমাদের সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে একটা কাজে থাকবার কথা ছিল। নাগাপ্পা চিঠিতে জানিয়েছে যে, অন্য বিশেষ দরকারে তাকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে বলে সন্ধ্যায় সে ল্যাবরেটরিতে আসতে পারবে না।

তার মানে নাগাপ্পা এর মধ্যেই বেরিয়ে গেছে? আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ—মামাবাবু যেন নিজেকে ধিক্কার দিয়েই বললেন,—আর একটু আগে হুঁশ হলে এই যাওয়াটা বন্ধ করতে পারতাম। এখন যে কোনো দুঃসংবাদের জন্যে তৈরী থাকতে হবে। চলো মহান্তী। আজ রাত্তিরটা খোলা আকাশের নিচেই কাটাতে হবে। সামান্য যা একটু দরকার সঙ্গে নাও।

মামাবাবুর কথাবার্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমি তখন যেমন অবাক তেমনি দস্তুরমত ক্ষুব্ধ। মহান্তী মামাবাবুর ফরমাশ রাখতে যাওয়ার পর বেশ গম্ভীর হয়ে বললাম,—তোমরা কোথায় কেন যাচ্ছ বুঝতে পারছি না। তা বোঝবারও এখন দরকার নেই। কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি ত?

তুই?—মামাবাবু বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছেন মনে হল। একটু ইতস্ততঃ করে শেষে একটু যেন অপ্রস্তুতভাবেই বললেন,—তুই,—মানে,—তুই গেলে এ লোধমা পাহাড়ে পাহারায় থাকবার আর কাউকে পাব না যে। মহান্তীর এ অঞ্চল ভালো করে চেনা বলে তাকে সঙ্গে নিতে হচ্ছে। কিন্তু এখানেও হুঁশিয়ার বিচক্ষণ কারুর থাকা ত দরকার! এ ভার নেবার মত আর কেউ যে নেই।

কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়, কিন্তু যুক্তির খাতিরে নয়, অভিমানেই টঙ-হয়ে-যাওয়া-মেজাজে গোমড়া মুখে মামাবাবুর অনুরোধটা তখনকার মত বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলাম।

লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে পাহারা দেবার ভার চাপিয়ে দিয়ে মামাবাবু শুধু মহান্তীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

মুখে প্রতিবাদ না করলেও মনে মনে এ ব্যবস্থায় গুমরেছি।

লোধমা পাহাড়ে পাহারা দেবার জন্যে কারুর যে থাকা দরকার মামাবাবুর এ যুক্তির বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। কিন্তু এ পাহারার দায় কি আর কারুর ওপর চাপানো যেত না? এ ভার নেবার সবচেয়ে উপযুক্ত লোক ত মহান্তী। তিনি এখানকার কর্তাব্যক্তিদের একজন। লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে এ সময়ে তাঁরই ত থাকা দরকার ছিল।

তাছাড়া আদিবাসীদের পাহাড়ের রহস্য-ভেদের সব চেয়ে দামী হদিস আমি যে কষ্ট করে যোগাড় করেছি এটুকু গর্ব নিশ্চয় করতে পারি।

বঙ্কুবাবুর দু দিন ধরে নিখোঁজ হবার খবরটা আমার কাছেই পেয়ে আমাকেই এখানে ফেলে রেখে যাওয়াটা কি মামাবাবুর উচিত হয়েছে? কোথায় কি কি দেখেছি তা আমি সঙ্গে থাকলে ত ভালো করে বোঝাতে পারতাম।

শুধু তাই নয়, বঙ্কুবাবুর খোঁজ করবার জন্যে কোথায় তাঁর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল সে জায়গাটা জানা ত একান্ত দরকার। বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। আমি সঙ্গে না থাকলে এখন থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মামাবাবুদের এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়ানোই ত সার হবে! রাত্রের অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি তাঁরা নিশ্চয় করবেন না।

মামাবাবু যাবার সময় বাইরে রাত কাটাবার কথা অবশ্য বলেছেন। তখন রাগে অভিমানে কথাটা ভালো করে খেয়াল করি নি। এখন কিন্তু ভাবতে গিয়ে মামাবাবুর মতলবটার কোনো মানে পেলাম না।

মামাবাবুর ওপর যতই অভিমান হোক তাঁর প্রতি অবিচার করতে পারব না। একেবারে কিছু না বুঝে-সুঝে নেহাত ঝোঁকের মাথায় অকারণে কিছু করবার মানুষ তিনি নন। অত ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে রাত পর্যন্ত পাহাড়ে জঙ্গলে কাটাবার মতলব যখন তিনি করেছেন, তখন কিছু একটা উদ্দেশ্য তার পেছনে নিশ্চয় আছে।

সে উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে বোঝবার চেষ্টায় এ পর্যন্ত আদিবাসী-খুনের রহস্য সম্বন্ধে যা যা যতটুকু জানা গেছে মনের মধ্যে একবার আউড়ে নিলাম।

গোড়া থেকে এ পর্যন্ত পরপর সমস্ত ব্যাপার সংক্ষেপে এই এই ভাবে সাজানো যায়।

প্রথম :—মহান্তীর লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেটের একজন আদিবাসী চাপরাসী বুনো ক্ষ্যাপা হাতির আক্রমণে মারা যাওয়ার খবর।

দ্বিতীয় :—আদিবাসীদের পবিত্র যে 'এঞ্জা' পাহাড়ে কারুর ওঠা বারণ তাতে দুরবীনের সাহায্যে আমার কাউকে উঠতে দেখা। এই গোপন আরোহী নাগাপ্পা বলে পরে সন্দেহ হওয়া।

তৃতীয় :—লোধমা পাহাড়ে সরকার সাহেবের কিছু ছেঁড়া বাজে কাগজের দলা কুড়িয়ে পাওয়া। মামাবাবুর বিচক্ষণতায় সে কাগজে সাঙ্কেতিক অক্ষরে প্ল্যাটিনমএর বাজারদর আর যে পাথর থেকে তা পাওয়া যায় তার আঁকা ইঙ্গিত আবিষ্কার।

চতুর্থ :—নাগাপ্পার বন্ধু ইংরেজ শিকারীর মারফত আদিবাসীর খুন হওয়ার দিন মহাবুয়াংএর ক্ষ্যাপা হাতীর এ অঞ্চলে আসা অসম্ভব বলে জানা।

পঞ্চম :—আমার ও বঙ্কুবাবুর কাছে আদিবাসীর খুনের জায়গায় নাগাপ্পার গোপন রহস্যজনক গতিবিধি ধরা পড়া।

ষষ্ঠ :—বঙ্কুবাবুর আশ্চর্যভাবে নিখোঁজ হওয়া।

সপ্তম :—মহাবুয়াংএর ক্ষ্যাপা হাতী এ অঞ্চলে আসা অসম্ভব হলেও আদিবাসীদের পাহাড়ে নাগাপ্পার সযত্নে সংগ্রহ করা জিনিস হাতীর বিষ্ঠা বলেই প্রমাণ হওয়া।

অষ্টম :—সরকার সাহেবের কুড়িয়ে পাওয়া কাগজের দলার হাতের লেখার সঙ্গে নাগাপ্পার লেখার কিছুটা মিল পাওয়া। সে কাগজও নাগাপ্পার অফিসের প্যাডের বলে সন্দেহ হওয়া।

নবম :—নাগাপ্পা যে কোম্পানীর প্রতিনিধি, তার নামটা সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধ হওয়ার কারণ পাওয়া।

দশম :—তাঁর গোপন গতিবিধি আমি লক্ষ্য করেছি জানবার পর নাগাপ্পার আমাকে আপ্যায়িত করবার চেষ্টা।

একাদশ : বঙ্কুবাবু দুদিন ধরে নিখোঁজ জানবার পর মামা-বাবুর অকস্মাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজনা।

দ্বাদশ :—বিকেলে মামাবাবুদের সঙ্গে ল্যাবরেটরীতে যোগ

দেবার কথা দিয়েও নাগাপ্পার হঠাৎ লোধমা পাহাড় ছেড়ে যাওয়া আর সে খবরে মামাবাবুর যেন বেশি রকম শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠা।

মোটামুটি এই বারো দফা খেই থেকে আপাততঃ একটি মাত্র ইঙ্গিত যা পাওয়া যাচ্ছে তা ত এই যে সুস্পষ্ট অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ এখনো না থাকলেও সমস্ত রহস্যের মধ্যে নাগাপ্পার নিশ্চিত একটা সন্দেহজনক ভূমিকা আছে।

বঙ্কুবাবু নিখোঁজ জেনে মামাবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু নাগাপ্পা হঠাৎ লোধমা পাহাড় ছেড়ে চলে গেছে জেনে সে উত্তেজনা যেন অস্থির আতঙ্ক হয়ে উঠেছে।

কেন?

নাগাপ্পার কোনো ভয়ঙ্কর মতলব তিনি কি তাহলে আঁচ করতে পেরেছেন? বাইরে সারা রাত কাটাবার কথা তাঁকে কি নাগাপ্পার শয়তানী ব্যর্থ করবার জন্যেই ভাবতে হয়েছে?

তাই হওয়াই সম্ভব। কিন্তু সারারাত বাইরে কাটালেই নাগাপ্পাকে কি তিনি ঠেকাতে পারবেন?

নাগাপ্পার শয়তানী মতলবই বা এখন কি হতে পারে?

কথাটা ভাবতে ভাবতেই পোড়ানো কাগজ-পত্রের ছাই-এ ভর্তি করা আদিবাসীদের পাহাড়ের সেই লুকোনো গর্তটার কথা মনে পড়ল। সেই লুকোনো গর্তে সমস্ত রহস্যের খুব দামী কিছু সূত্র যে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আহাম্মক বঙ্কুবাবুর যুক্তি শোনাই সেদিন ভুল হয়েছে। গর্তটা আরো ভালো করে হাতড়ে তার কিছু মাল-মশলা সেদিন সঙ্গে নিয়ে আসাই উচিত ছিল। নাগাপ্পার বিরুদ্ধে কিছু জোরালো প্রমাণ হয়ত তাহলে হাতে থাকত।

সেই গোপন গর্তটাই যে নাগাপ্পার এখন প্রধান লক্ষ্য হবে এ বিষয়ে আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। আদিবাসী খুন

হওয়ার ব্যাপারের এমন একটা সাক্ষ্য প্রমাণের পুঁজি নাগাপ্পা অন্যের হাতে নিশ্চয় পড়তে দেবেন না। তাঁর ওপর সন্দেহ যখন জেগেছে বলে তিনি টের পেয়েছেন, তখন সামান্য কিছু সূত্রও কোথাও থাকলে তিনি তা নষ্ট করবার চেষ্টাই আগে করবেন।

কিন্তু আর যাই বুঝে থাকুন, মামাবাবু এই গোপন গর্তের কথা ত কিছু জানেন না। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বললেও নিজে থেকে এ গর্ত খুঁজে পাওয়া মামাবাবুর পক্ষে অসম্ভব।

নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে এর পর মনে আর কোনো দ্বিধা থাকে না। মামাবাবুর আমাকে সঙ্গে না নেওয়া ভুল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমারও অভিমান করে তাঁবুতে বসে থাকা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। এতক্ষণে নাগাপ্পা অনেকখানি এগিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু বঙ্কুবাবুর দেখানো পাকদণ্ডীর পথ যদি তাঁর জানা না থাকে, তাহলে এখনো হয়ত ঘুরপথে মাঝামাঝির বেশি তিনি পৌঁছোন নি। একবার মাত্র দেখা পাকদণ্ডীর পথ ঠিক মত চিনতে পারলে তাঁর আগে না হোক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গায় আমি পৌঁছোতে পারি।

এগারো

এক মুহূর্ত আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম। সারারাত বাইরে কাটাবার সম্ভাবনায় একবার একটা কম্বল গোছের কিছু সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু চড়াইএর পথে তাড়াতাড়ি যাওয়ার তাতে বাধা হতে পারে ভেবে সে ইচ্ছাকে আর প্রশ্রয় দিই নি।

আমি যখন বেরিয়েছি, তখন রোদের তেজ কমতে সুরু করে একটু লাল আভা তাতে লেগেছে। পাহাড়ের যে পিঠটা দিয়ে উঠতে হবে ভাগ্যক্রমে সেটা পশ্চিম ঢাল। ঘণ্টা দুইএর মত দিনের আলোয় পথ দেখে ওঠবার সুযোগ তাই পাওয়া যাবে। পাকদণ্ডীর পথ চিনতে ভুল না হলে এই ঘণ্টা দুয়েকই যথেষ্ট। তার মধ্যেই ওপারের উপত্যকায় পৌছোন শক্ত হবে না।

প্রথম দিকটায় একটু ধুকধুকুনি থাকলেও কিছুদূর ওঠবার পর মনের জোর বেড়েছে। জংলা পাহাড়ে একবার মাত্র উঠে নির্ভুল পথের চিহ্ন মনে করে রাখা প্রায় অসম্ভব। তবু মাঝে মাঝে দু একটা সেরকম চিহ্নই যেন পেয়েছি বলে মনে হয়েছে।

পাহাড়ের পথে উঠতে মামাবাবু আর মহান্তীর জন্যেও চারিদিকে নজর রেখেছি। কোনরকমে তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা হয়ে গেলে এখন সব চেয়ে ভালো হয়, ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়ার সময় কম্বল ত নয়ই সঙ্গে একটা টর্চ বা অস্ত্র-শস্ত্র গোছের কিছুও নিই নি। পাহাড়ের ওপরে ঠিক সময়ে পৌছে নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল করতে পারলেও তারপর রাতের কথা ভাবতে হবে। চিতা বা ভালুকের মত হিংস্র জন্তু-জানোয়ার এ পাহাড়ে ত আছেই, তার ওপর নাগাপ্পা যার বিষ্ঠার নমুনা দেখিয়েছেন সে ক্ষ্যাপা হাতী থাকাও অসম্ভব নয়।

আত্মরক্ষার কোনো কিছুই যখন সঙ্গে নেই, তখন মামাবাবুদের উল্টে দেখা হয়ে যাওয়ার ওপরই একমাত্র ভরসা।

কিন্তু সে আশাই শুধু বিফল হল না, ওপরে ওঠবার পর চারিদিকে একেবারে শূন্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

ওপরের উপত্যকায় পৌঁছেই নাগাপ্পার সাড়া পাব জেনে শেষের দিকটা বেশ সন্তর্পণে উঠছিলাম। ভেবেছিলাম নাগাপ্পাকে একেবারে যথাস্থানে যদি না দেখি, তাহলে খানিকটা অপেক্ষা করলেই তিনি উদয় হবেন। গোপনে নিঃশব্দে তাঁর ওপর নজর রাখবার জন্যে জংলা গাছ আর পাথরের বড় বড় চাঁইএর আড়াল দিয়ে গুঁড়ি মেরে গর্তের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি গিয়ে ঘাপটি মেরে বসেছিলাম।

কিন্তু কোথায় নাগাপ্পা! প্রায় আধ ঘণ্টা বৃথাই অপেক্ষা করার পর চিন্তিত হয়ে উঠলাম। আমি পৌঁছোবার আগেই কি নাগাপ্পা তাঁর কাজ সেরে চলে গিয়েছেন? কিন্তু তা ত অসম্ভব।

তাহলে আমার সমস্ত অনুমানই কি ভুল? এই লুকোনো গর্তের মাল-মশলা সম্বন্ধে নাগাপ্পার কোনো মাথাব্যথা নেই? অন্ততঃ আজই সেগুলো সরাবার জন্যে তিনি ব্যস্ত হন নি।

নাগাপ্পা তাহলে কোথায় কি মতলবে এসেছেন? মামাবাবুই বা মহান্তীকে নিয়ে কি কাজে কোথায় ঘুরছেন? নিজের বুদ্ধির দোষে এক আজগুবি ধান্দায় এখানে এসে যে আহাম্মকি করেছি তারপর কি এখন আমি করতে পারি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ পাহাড় থেকে নেমে লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা? এখনও পা বাড়ালে কিছুটা আলোয় আলোয় অবশ্য নামা যাবে, কিন্তু তারপর? লোধমার ছাউনি পর্যন্ত পাহাড় জঙ্গলের একেবারে জনমানবহীন পথ ত আগাগোড়া অন্ধকার।

অস্বীকার করব না যে ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা বেশ একটু কেঁপে উঠল।

কিন্তু ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় যখন নেই, তখন সেইটাই মেনে নিতে হবে।

যাবার আগে শুধু লুকোনো গর্তটা একবার নিজের চোখে দেখে যেতে চাই। প্রায় অসম্ভব হলেও নাগাপ্পা আমার আগে এসে কাজ সেরে গেছেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। এখনও পর্যন্ত যদি তা না পেরে থাকেন, তাহলে সেদিনকার ভুলটা সংশোধনও করতে হবে। গর্তটা ভালো করে তলা পর্যন্ত ঘেঁটে কাজে লাগাবার মত যা কিছু পাই আজ আর সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলব না।

সেই উদ্দেশ্যেই ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে লুকোনো গর্তটার কাছে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

চমকটা ভয়ের নয়। তার বদলে বিস্ময়, উল্লাস আর সেই সঙ্গে গভীর বিমূঢ়তার বললে কিছুটা বোঝানো যাবে।

চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আমার বাঁ দিকে কিছু দূরে কটা জংলী গাছের জটলার মধ্যে বেশ চড়া গলার একটা বচসা শুনে। বচসা না বলে তাকে এক তরফা বকুনিই বলা উচিত। এক পক্ষ জ্বলন্ত স্বরে ধমক দিচ্ছে, আর অন্য পক্ষ ভয়ে ভয়ে যেন একটু প্রতিবাদ করে থেমে যাচ্ছে।

দু-পক্ষের গলাই আমার চেনা। তার মধ্যে একটি গলা আর কারুর নয়—বঙ্কুবাবুর।

বিস্ময় আর প্রায় অধীর উল্লাসটা সেই কারণে।

বঙ্কুবাবু তাহলে বেঁচে আছেন। শুধু বেঁচে নেই রীতিমত বহাল তবিয়তে যে আছেন তাঁর ছুঁচের মতো সরু তীক্ষ্ণ গলার জোরেই তার প্রমাণ।

হ্যাঁ, বঙ্কুবাবুই রেগে কাঁই হয়ে কান ফুটো করা গলায় ধমক দিচ্ছেন আর ভয়ে ভয়ে তার মৃদু প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করছেন সরকার সাহেব।

আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে রীতিমত বিস্ময়-বিমূঢ়তাটা এই উল্টো পালার দরুন।

বিমূঢ়তাটা যত বেশিই হোক তার সঙ্গে বেশ একটু খুশিও তখন আমার মনে মেশানো।

আজীবন অন্যায় জুলুম সয়ে সয়ে বঙ্কুবাবুও তাহলে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন, অসহ্য খোঁচানিতে নিরীহ পোকা যেমন রুখে দাঁড়ায়!

সরকার সাহেবের নাকাল অবস্থাটা চাক্ষুষ দেখবার লোভ হচ্ছিল। কিন্তু কাছে যেতে গিয়ে ওঁদের চোখে পড়লে সরকার সাহেবের চেয়েও বঙ্কুবাবুই বেশী অপ্রস্তুত হবেন। তাই গর্তটা খুঁজে নিয়ে সেটার ছাই মাটি সরিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে দূর থেকেই বঙ্কুবাবুর বকুনি থেকে তাঁর রাগের কারণটা বোঝার চেষ্টা করলাম।

তাঁর এ দুদিনের অন্তর্ধানের রহস্য থেকে সুরু করে বঙ্কুবাবুর কাছে অনেক কিছুই এখন জানবার আছে। কিন্তু তাঁর পাত্তা যখন পেয়ে গেছি, তখন আমি নিশ্চিন্ত। লোধমা পাহাড়ে ফেরা সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনা নেই। নির্ভাবনায় এই লুকানো গর্তের মালমশলা যা যা দরকার আপাততঃ বাছাই করে নিতে পারি।

লুকোনো গর্তটায় ইতিমধ্যে আর যে কারুর হাত পড়েনি এটা সত্যিই আশ্চর্য।

সৌভাগ্যটা সত্যিই আশাতীত বলতে হয়।

নাগাপ্পার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসেই এটা হয়েছে বুঝলাম। এ গর্ত যে আর কেউ খুঁজে বার করে তার আসল মর্মটা আঁচ করতে পারে নাগাপ্পা তা কল্পনাই করেন নি। সুবিধা ও সময় মত এ গর্তের জিনিস সরালেই হবে এই বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে না থাকলে এ গর্তের জিনিস দ্বিতীয়বার ঘাঁটবার সুযোগ আমি পেতাম না।

ওপরের শুকনো পাতাটাতার জঞ্জাল সরিয়ে গর্তটার ভেতরে হাত চালাতে চালাতে বঙ্কুবাবুর প্রায় ক্ষেপে ওঠা গলার ধমক আর বকুনি শুনতে পাচ্ছিলাম।

ওপর ওপর যেটুকু শুনলাম, তাতে বঙ্কুবাবুর রাগের কারণটা ঠিক স্পষ্ট অবশ্য বোঝা না গেলেও এই দুদিন ধরে তাঁর পাহাড়ে জঙ্গলে কাটাতে হওয়ার জন্যেই সরকার সাহেবের ওপর মেজাজটা যে খিচড়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না।

তাঁর এক আধটা কথায় সেই গায়ের জ্বালাই প্রকাশ পাচ্ছিল।

বড় চাকরে হয়েছেন! সাহেব সেজে ডাঁট দেখাচ্ছেন অফিসে। ভাবছেন উনি একটা মস্ত কেও কেটা! ওঁকে ঘাড়ধাক্কায় একেবারে পাহাড়ের তলায় গড়িয়ে দেবার কেউ নেই! কোন্ মাতব্বরী করছিলেন ওখানে যে একবার খবর নিয়ে যাবার ফুরসত হয় নি!

জবাবে সরকার সাহেব কি যেন একটা বললেন। তাতে যেন আগুনে ঘি পড়ল। বঙ্কুবাবুর গলা আরো ছুঁচোল হয়ে উঠল,—হ্যাঁ, আমি ত একটা হেঁচি পেঁজি আরদালী! ম্যানেজার সাহেব তাই আমার কথা ভুলেই গেছলেন·····

শুনতে শুনতে বঙ্কুবাবুর কথাগুলো যেন কোথায় হারিয়ে গেল। গর্তটা হাঁটকাতে হাঁটকাতে তখন এমন কিছু পেয়েছি যে সমস্ত মন তাতেই মগ্ন হয়ে গেছে।

জিনিসটা সামান্য একটা পেতলের চাকতি। কিন্তু এই খুনের রহস্যের ব্যাপারে তার দাম যে কত তা আমার বুঝতে বাকি নেই।

পেতলের চাকতিটা পিয়ন বা আরদালীদের ব্যাজ গোছের। তাদের জামায়, কোমরবন্ধে বা হাতার ওপরে লাগান থাকে। এ চাকতিটা বিশেষভাবে আমার চেনা। মহান্তীর লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেটের চাপরাসী পিয়নদের পোশাকে এ চাকতি আমি দেখেছি।

চাকতিটা পাবার পর উদগ্রীব হয়ে গর্তটা আরো তাড়াতাড়ি হাঁটকাতে লাগলাম।

বেশীর ভাগই শুধু ছাইপাঁশ। তার ভেতর থেকে অর্ধেক-পোড়া

কটা কাগজের টুকরো মাত্র উদ্ধার করা গেল। কিন্তু সেই একটা টুকরোই ভালো করে লক্ষ্য করে স্থান কাল সব ভুলে যেতে আমার দেরি হল না।

কাগজের টুকরোটার ওপর ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরের লেখাগুলো কোনটাই সম্পূর্ণ পড়বার উপায় নেই। কাটাকাটা কটা শব্দ আর সংখ্যা মাত্র তা থেকে পড়া যায়।

কিন্তু সেই সামান্য শব্দ আর সংখ্যাই মাথার টনক নড়াবার পক্ষে যথেষ্ট।

এক জায়গায় একটা শব্দ পাওয়া গেল ইংরাজিতে Olivi...

শব্দটা সম্পূর্ণ নয়, তার বাকি অংশটা পুড়ে গেছে। সেই টুকরো কাগজটাতেই আর একটা সংখ্যা লেখা—৩.৪!

সংখ্যাটার শেষে এই বিস্ময়ের চিহ্নটাই অদ্ভুত। আর তার চেয়ে বেশি অদ্ভুত আর একটা আধ-পোড়া কাগজের টুকরোয় বোলতার চাকের মত একটা ছবির অংশ।

পোড়া কাগজে যেটুকু আছে তা দেখেই ছবিটা কিসের তা আমি এক নিমেষে বুঝলাম। এই ছবির মর্মই নাগাপ্পার আস্তানায় মামা-বাবু আজই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ছবিটার নিচে একটা নতুন শব্দও পাওয়া গেল। শব্দের সামনের একটা অক্ষর নেই। পরে যা লেখা আছে তা হল ..... imberlite।

তন্ময় হয়ে এই কাগজগুলো দেখতে দেখতে বঙ্কুবাবু আর সরকার সাহেবের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একেবারে ঘাড়ের কাছে একটা নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেয়ে চমকে ফিরে দেখি, বঙ্কুবাবু।

কখন যে তাঁদের ঝগড়া থামিয়ে বঙ্কুবাবু আমার পেছনে এসে কৌতূহলের উঁকি দিতে বসেছেন তা টেরই পাই নি।

উৎসাহভরে বললাম,—কি পেয়েছি দেখছেন?

তা ত দেখছি। বঙ্কুবাবু পাশে এসে বসে তার পেটেন্ট কাঁদুনে গলায় বললেন, কিন্তু আপনি কখন এখানে এলেন ?

পোড়া কাগজের টুকরোগুলো সযত্নে পকেটে রাখতে রাখতে হেসে বললাম,—এসেছি বেশ কিছুক্ষণ। তখন আপনি সরকার সাহেবকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছেন। সত্যি এত দিনের অত্যাচারের শোধ যা নিয়েছেন তাতে কি খুশী হয়েছি কি বলব!

বঙ্কুবাবুর মুখখানা এবার দেখবার মত। আমার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ছুঁচলো গলার যেন অভিযোগের সুরে বললেন,—আপনি আমাদের ঝগড়াও তাহলে শুনেছেন ?

সব কি আর শুনেছি। বঙ্কুবাবুকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলাম, শুনতে শুনতে এই গর্তে যা পেলাম তাতে আর কোন কিছুর হুঁশই রইল না।

পেয়েছেন ত ওই দুটো পোড়া কাগজকুচি—বঙ্কুবাবুর বিদ্রূপের চেষ্টা কাঁদুনে গলায় ঠিক ফুটল না।

শুধু পোড়া কাগজকুচি!—এবার বঙ্কুবাবুকে অবাক করবার জন্যেই পকেট থেকে চাকতিটা বার করে বললাম,—দেখেছেন, এটা কি ?

এবার বঙ্কুবাবুর চোখ দুটো সত্যিই বিস্ফারিত হল।

তাঁকে আরো ভালো করে আমার কৃতিত্বটা জানাবার জন্যে বললাম,—এ চাকতিটার মানে বুঝতে পারছেন ? এ হল লোকনাথ মাইনিং সিণ্ডিকেটের পিয়ন চাপরাসীদের চিহ্নিত করবার চাকতি। আদিবাসী পিয়নটির এ চাকতি এই গর্তের ভেতর কে পুঁতে রাখতে পারে ? ক্ষ্যাপা হাতী গোদা পায়ে থেঁতলে মেরে এখানে গর্ত খুঁড়ে চাকতি পুঁতে নিশ্চয় রাখে নি। এ কাজ কোনো মানুষের আর এরকম ভাবে লুকোবার চেষ্টা থেকেই আদিবাসি পিয়নকে খুন করার আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়তে পারে।

তাহলে আদিবাসী পিয়নকে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ খুন

করেছে, আপনি মনে করেন ? বঙ্কুবাবুর জিজ্ঞাসার ধরনে মনে হল আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে বলেই তাঁর সন্দেহ,—কিন্তু একটা সামান্য জংলী পিয়নকে এত প্যাঁচ কষে খুন করবার সত্যি কোনো কারণ থাকতে পারে কি ?

নিশ্চয় পারে।—জোর দিয়েই বলতে পারলাম এবার, আর সে কারণ যে কি তা এই পোড়া কাগজকুচির মধ্যেই পাওয়া অসম্ভব নয়। মামাবাবুর সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে গেলে এখুনি হয়ত ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যেত।

এখানে মামাবাবুর সঙ্গে দেখা! বঙ্কুবাবু বেশ হতভম্ব—এখানে তিনি কোথা থেকে আসবেন! তাঁর ত আপনার মত মাথায় পোকা ঢোকে নি!

ঢুকেছে আরো বেশী!—বলে দুপুরে নাগাপ্পার ছাউনির সভায় যা যা হয়েছে ও তারপরে মামাবাবু ও মহান্তী যেভাবে এ পাহাড়ের দিকেই রওনা হয়েছেন তার মোটামুটি বিবরণ বঙ্কুবাবুকে দিলাম।

এ বিবরণ সত্যি কথা বলতে গেলে বঙ্কুবাবুর খাতিরে দিই নি। নিজের মনেই সমস্ত ব্যাপারটা আরো ভালো করে গুছিয়ে নেবার জন্যে প্রায় স্বগতভাবে মুখে বলে গিয়েছি।

বিবরণ দিয়ে নিজের আশাটার ওপর আর একবার জোর দিয়ে বললাম,—সরকার সাহেবের ওই ছেঁড়া কাগজের দলা থেকে মামা-বাবু যা উদ্ধার করেছেন এ পোড়া কাগজকুচি পেলে তার চেয়ে বেশি কিছু পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

দেখি কাগজগুলো! এতক্ষণে বঙ্কুবাবু আগ্রহ প্রকাশ না করে পারলে না।

না, আর এ কাগজ আপনার হাতেও দিচ্ছি না!—হেসে পকেটটায় হাত চাপা দিয়ে বললাম, আর এ কাগজ নিয়ে আপনি করবেনই বা কি। আপনি খনিজ বিশারদও নন, গোয়েন্দাও নন।

না, তা কিছুই নই!—করুণ কাঁদুনে গলায় স্বীকার করলেন বঙ্কুবাবু। আমি ত একটা আরদালীর বেশী কিছু না!

সরকার সাহেবের ওপর বঙ্কুবাবুর খানিক আগেকার তড়পানির কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় হেসে ফেলে বললাম,—কিন্তু যেমন তেমন আরদালী নন। ক্ষেপলে বড় সাহেবকে পর্যন্ত কেঁচো বানিয়ে ছাড়েন। আচ্ছা সত্যি আপনার ব্যাপারটা কি বলুন ত? সেই আমার সঙ্গে এই পাহাড়ে ছাড়াছাড়ি হবার পর এ পর্যন্ত করছিলেন কি? ছিলেনই বা কোথায়?

কোথায় ছিলাম জিজ্ঞাসা করছেন! জিজ্ঞাসা করতে পারছেন?

আপনার লজ্জা করছে না!—বঙ্কুবাবুর কাঁদুনে গলা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল অভিযোগে—একবার খোঁজ নিতে আসার কথাও মনে হয়েছিল কি? তিন দিন যে ফিরে যাই নি তা খেয়ালও বোধহয় করেন নি।

বিরক্তি নয়, বঙ্কুবাবুর অভিযোগে তাঁর ওপর সহানুভূতিই হল। সত্যিই তাঁর পক্ষে নিজেকে সকলের এরকম পায়ে-ঠেলা ভাবা কিছু অন্যায় ত নয়। তিনি যে এ কদিন লোধমা পাহাড়ে নেই তা নিয়ে কারুর ত এতটুকু মাথাব্যথা দেখি নি।

মাথাব্যথা বেশীরকম থাকা সত্ত্বেও কেন যে তাঁর খোঁজ নিতে আসতে পারি নি, সে কথা যথাসাধ্য বঙ্কুবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম এর পর।

প্রথমতঃ তিনি যে সেদিন সকালে আমার গোয়েন্দাগিরির ধান্দায় সহায় হয়ে গিয়েছিলেন, সে কথাটা জানালে সরকার সাহেবের কাছে তাঁর লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না বলেই অনুমান করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত হয়ত তাঁর চাকরি নিয়েই টানাটানি হতে পারে বলে ভয় হয়েছিল। অথচ তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়া সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে আমার সঙ্গে তাঁর আদিবাসীদের পাহাড়ে যাওয়ার কথাটা লুকোন যেত না।

অত্যন্ত অস্থির হলেও এ বেলা কি ও বেলা ফিরে আসবেন আশা করে তাই দুটো দিন বাধ্য হয়ে নিশ্চেষ্ট থাকতে হয়েছে।

আমার কৈফিয়তে বঙ্কুবাবুর মুখে একটু প্রসন্নতার আভা দেখে আগের প্রশ্নটাই আবার করলাম।

আচ্ছা সত্যি কি হয়েছিল বলুন ত এবার। দু দিন দু রাত ছিলেন কোথায়?

হয়েছিল যা তা ভয়ানক, আর—বঙ্কুবাবু আমায় একেবারে হতভম্ব করে দিয়ে বললেন,—ছিলাম এঞ্জা পাহাড়ে।

এঞ্জা পাহাড়ে! আমি অবিশ্বাস ভরে বেশ একটু ভ্রূকুটির সঙ্গে বঙ্কুবাবুর দিকে তাকালাম।

কিন্তু বঙ্কুবাবু ত ঠাট্টা করবার মানুষ নন। তাই কথাটা ঠিক শুনেছি কিনা যাচাই করবার জন্যে আবার জিজ্ঞাসা করতে হল,—এরা পাহাড়ে কি বলছেন? সেখানে পা দেওয়া বারণ আপনি জানেন না?

খুব জানি।—বঙ্কুবাবু এক কথায় স্বীকার করে বললেন,—কিন্তু ওই বারণ বলেই সেখানে গিয়ে উঠেছিলাম আর তাতেই এ পর্যন্ত প্রাণটা ধড়ে আছে।

তার মানে!—রীতিমত বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—প্রাণ যাবার মত কি হয়েছিল আবার এর মধ্যে?

যা হয়েছিল বঙ্কুবাবুর সঙ্গে যেতে যেতে সংক্ষেপে শুনলাম এরপর। শুনে সত্যিই অবাক হলাম।

আমায় সোজা পথ ধরিয়ে দিয়ে বঙ্কুবাবু সেদিন সাধারণের অজানা পাকদণ্ডীর পথে আদিবাসীদের পাহাড় থেকে নামছিলেন। হঠাৎ এক জায়গায় বন্দুকের শব্দে তিনি চমকে থেমে যান।

পাহাড়ে জঙ্গলে কাছাকাছি কোন শিকারীর বন্দুকের আওয়াজ শুনেছেন বলে ভাববার তখন আর উপায় নেই। বন্দুকের গুলিটা তাঁর মাত্র হাত কয়েক দূরের একটা পাথরে লেগে ছিট্‌কে গেছে।

এ গুলিটা আকস্মিকও যে নয়, একটু অপেক্ষা করার পর আবার নামতে গিয়েই তা টের পাওয়া গেছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও আরেকটা গুলির শব্দ তখন প্রতিধ্বনি তুলেছে পাহাড়ময়। গুলিটা যে তাঁর উদ্দেশ্যেই ছোড়া এ বিষয়ে তখন আর কোন সন্দেহ নেই।

গুলিটা নিচে থেকে কেউ ছুড়ছে, এই হয়েছে বঙ্কুবাবুর পক্ষে মুশকিল। ওপর থেকে কেউ ছুড়লে পাকদণ্ডীর পথে তাড়তাড়ি নেমে গুলির নাগালের বাইরে পৌছে যাবার আশা করতে পারতেন। কিন্তু দুশমন নিচে থাকায় নামতে গিয়ে তার খর্পরেই পড়বার ভয় হয়েছে।

অনেক ভেবেচিন্তে বঙ্কুবাবু ওপরেই ওঠবার চেষ্টা করেছেন

এবার। যতদূর সম্ভব ঝোপ-জঙ্গলে আর চাঁই পাথরের আড়াল দিয়ে ওপরে উঠতে কম সময় লাগে নি, কিন্তু দু-একবার গুলির নিশানা হলেও শেষ পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় আদিবাসীদের পাহাড়ের মাথায় উঠে আসতে পেরেছেন।

ওপরে উঠে বঙ্কুবাবু আর দ্বিধা করেন নি। লোধমা পাহাড়ে ফিরে যাবার চেষ্টা তখন বাতুলতা মনে হয়েছে। নিচে থেকে যে তাঁকে গুলি করতে চেষ্টা করেছে, সে এবারে হার মেনেই হাল ছেড়ে দেবার পাত্র বোধহয় নয়। এখানে বিফল হলেও লোধমা পাহাড়ে যাবার পথে কোথাও সে ওত পেতে থাকবেই। কোথায় যে থাকতে পারে তা ঠিকমত জানা যখন অসম্ভব, তখন লোধমা পাহাড়ে যাবার ইচ্ছেটা অন্তত তখনকার মত চেপে থাকাই উচিত বলে বঙ্কুবাবুর মনে হয়েছে।

লোধমা পাহাড়ে ফিরে না গেলে কোথায় বা নিরাপদে থাকা যায় ভাবতে গিয়ে হঠাৎ ঝঞ্ঝা পাহাড়ের বিদঘুটে চূড়োটার দিকে তাঁর দৃষ্টি গেছে। আর সেই সঙ্গে মনে হয়েছে আদিবাসীদের অভিশাপে ঘেরা হওয়ার দরুনই এঞ্ঝা পাহাড় তাঁর পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ গোপন আশ্রয়।

বড়বাবুর সমস্ত কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু আপনাকে এভাবে গুলি করার চেষ্টা কে করতে পারে? যার পক্ষে করা সম্ভব সে ত আদিবাসীদের গাঁয়ের দিকেই উঠে গিয়েছিল!

উঠে যেতেই আমরা দেখেছি।—বঙ্কুবাবু, কাঁদুনে গলায় বললেন—তার সঙ্গে আমাদের চোখ দুটো ত আর পাঠাই নি। কিছুদূর যাবার পর অন্য পথে পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে নেমে ওত পেতে থাকা শক্ত কিছু নয়।

কিন্তু কেন আপনার ওপর এ আক্রোশ?

এঞ্ঝা পাহাড়ে গেলে বুঝবেন।— বলে বঙ্কুবাবু হাসলেন।

এঞ্ঝা পাহাড়!—সবিস্ময়ে বললাম, সেখানেই যাচ্ছি নাকি?

বারো

হ্যাঁ, এঞ্জা পাহাড়েই শেষ পর্যন্ত সেদিন গেলাম।

নিয়ে গেলেন অবশ্য বঙ্কুবাবুই। তিনি না পথ দেখালে আদিবাসীদের বসতির পাহাড় থেকে তাদের পবিত্র এঞ্জা পাহাড়ে যাবার গোপন রাস্তা সাত দিন সাত রাত খুঁজেও আমার পক্ষে বার করা সম্ভব হত না।

দুটো পাহাড়ের একটা জোড় অবশ্য এ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করলে আমাদের মত আনাড়ির চোখেও পড়তে পারে। কিন্তু বিরাট কোনো দানবীর ক্ষুরের খোলা ফলার মত সে ত খানিকটা খাড়া আর সম্পূর্ণ ন্যাড়া পাথরের ফালি মাত্র। সে জোড়ের পাহাড়ের গা-টা একেবারে মসৃণ আর মাথাটা ধারালো ফলার মত এমন সঙ্কীর্ণ যে মানুষ ত ছার পাহাড়ী ছাগলও তার ওপর দিয়ে যেতে পারে না।

সেই জোড়ের মাথার ওপর দিয়ে নয়, নিচের এক জায়গার আধা সুড়ঙ্গ আধা খাঁজ গোছের একটি লুকোনো অজানা পথ দিয়ে বঙ্কুবাবু যখন আমাকে এঞ্জা পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে তুললেন তখন হাত পা শুধু নয় বুকের ভেতরটা পর্যন্ত আমার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

শুধু যে অত্যন্ত দুর্গম সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী পথে প্রতি মুহূর্তে একেবারে অতলে পড়ে গুঁড়িয়ে যাবার ভয়েই হাত পা আর বুকের ভেতরটা হিম হয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে ঝড় বৃষ্টিরও বেশ একটু সাহায্য আছে।

আদিবাসীদের বসতির পাহাড় থেকে এঞ্জা পাহাড়ে যাবার গোপন রাস্তার মাঝামাঝি পৌঁছোবার পরই হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। তখন এগোনো আর পেছোনো দুই সমান। মরিয়া হয়ে তাই সামনেই কখনো কুঁজো হয়ে কখনো রীতিমত হামাগুড়ি দিয়েই

এগুতে হয়েছে আগে আগে পথ দেখিয়ে গেলেও বঙ্কুবাবুকে আমার চেয়ে খুব সাহসী মনে হয় নি। এক আধবার খুব অতল খাড়াই-এর ধারে তাঁর মুখের চেহারা যা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে অতি বড় গরজ না থাকলে সখ করে এরকম বিপদের রাস্তায় তিনি আসতেন না।

গরজটা যে কত বড় এঞ্চা পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছোবার খানিক বাদেই তা বোঝা গেছে। শুধু পাহাড়ের দুর্গম রাস্তায় আমাদের বিপদে ফেলবার জন্যেই ঝড়-বৃষ্টিটা যেন কোথায় ওত পেছে ছিল। আমরা রাস্তাটা পেরিয়ে আসবার পরই তখন প্রায় থেমে এসেছে।

বিপদ কাটিয়ে বঙ্কুবাবুর চেহারাও তখন অন্য রকম। যেতে যেতে আমাকে উৎসাহভরে এঞ্চা পাহাড়ের পরিচয় দিচ্ছিলেন।

আদিবাসীদের এ পবিত্র পাহাড়টা সম্বন্ধে এখনকার মত কড়াক্কড়ি বছর কুড়ি আগেও নাকি ছিল না। ইংরেজদের আমলে খনির কাজ-কারবারে প্রথম যে বিদেশীরা এ অঞ্চলে আসে তারা লোখমার বদলে এই পাহাড়েই তাদের ঘাঁটি বসিয়েছিল। তাদের তৈরী দু-একটা বাড়িঘরের চিহ্ন এখনো এ পাহাড়ে দেখা যায়। পাহাড়ের এক একটা জায়গার ইংরেজী নামেও সেকালের ছোঁয়া লেগে আছে, যেমন, ক্যামেল-হিল, পীক-ভিউ, স্নেক ভ্যালি ইত্যাদি।

উটের পিঠের কুঁজের মত একটা পাথুরে ঢিবির তারা নাম দিয়েছিল ক্যামেল-হিল। চারিদিকের পাহাড় জঙ্গলের মাঝে কিছুটা সমতল একটা আঁকাবাঁকা উপত্যকা গোছের জায়গাকে বলত স্নেক ভ্যালি আর প্রায় খাড়া অতলে নেমে যাওয়া একটা খাদের পাহাড়ের খানিকটা খাঁজ তাদের কাছে ছিল পীক-ভিউ। প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু এ পীক-ভিউ-এর নামটা ভুল দেওয়া হয় নি। সেখান থেকে দূরের দিকচক্রবালঘেরা যে দৃশ্য নিচে দেখা যায় তা সত্যিই অপূর্ব।

এঞ্জা পাহাড় যে অদিবাসীদের কাছে পবিত্র তা বিদেশীদের বোধহয় জানাই ছিল না, কিংবা জানলেও তারা গ্রাহ্য করে নি। এ পাহাড়ে মৌরসী পাট্টা নিয়ে একটা মনোরম সাহেবী আস্তানা গড়ে তুলবে এই ছিল তাদের কল্পনা। যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না কোনদিন তার সত্যি সত্যি গণেশ ওল্টাবে তা কি তারা তখন ভাবতে পেরেছে ?

কিন্তু সত্যিই অসম্ভব একদিন সম্ভব হল। রাজ্যপাট একদিন উঠল। সেই সঙ্গে কপালের দোষ কিংবা চেষ্টার ত্রুটিতে খনিব কাজেও সুবিধে করতে না পেরে একদিন পাততাড়ি গুটিয়ে বিদেশীর দল আর কোথাও পাড়ি দিলে।

দেশ নিজেদের হাতে আসবার পর আর কিছু না হোক আদিবাসীদের ওপর সুবিচারের চেষ্টা হয়েছে। তাদের পবিত্র 'এঞ্জা' পাহাড়ের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার এখন তাদেরই।

বঙ্কুবাবুব বিবরণ শুনতে ভালোই লাগছিল কিন্তু হঠাৎ সন্দেহ হল কথা বলার উৎসাহে কোথায় যাচ্ছেন বঙ্কুবাবু তা বোধহয় ভুলেই গেছেন।

এদিকে ঝড় বৃষ্টি থেমে গেলেও মেঘগুলো আরো ছড়িয়ে আকাশটা প্রায় ঢেকে ফেলেছে। সূর্য ডুবতে তখন আর দেরী নেই। তার ওপর এই মেঘের আবরণের দরুন এই পাহাড়ের মাঝখানেও যেন সন্ধ্যার অন্ধকার আগে থাকতেই ঘন হতে সুরু করেছে।

দাঁড়িয়ে পড়ে বঙ্কুবাবুকে বাধা দিয়ে সেই কথাই জানালাম,—সন্ধ্যা হয়ে এল টের পাচ্ছেন ?

সন্ধ্যা। বঙ্কুবাবুর যেন সত্যিই এতক্ষণে সে হুঁশ হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন,--তা সন্ধ্যে হলে ক্ষতিটা কি ? সন্ধ্যে ত সময় মত হবেই।

কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায় ? এরপর আর কিছু দেখা যাবে ? —একটু অধৈর্যের সঙ্গেই বললাম,—মনে আছে এঞ্জা পাহাড়ে কি

যেন আমায় দেখাবেন বলেছিলেন যা দেখলেই নাগাপ্পার কেন আপনার ওপর এত আক্রোশ বুঝতে পারব ?

বঙ্কুবাবু প্রথম আমার দিকে যে ভাবে চাইলেন তাতে মনে হল আমি আবোল তাবোল কিছু বকছি বলেই তাঁর সন্দেহ হচ্ছে। তারপর নিজের প্রতিশ্রুতিটা মনে পড়ায় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠলেন, বললেন,—সত্যি সে কথাটা ভুলেই গেছলাম। তবে নিরাশ হবার কিছু নেই। এঞ্জা পাহাড়ে যখন এসেছেন, তখন যা দেখবার সবই দেখবেন। আর আমি যা দেখাবার কথা বলেছি রাত্রেও তা দেখা আটকাবে না।

রাত্রেও দেখা যাবে।—আমি সন্দিগ্ধভাবে বঙ্কুবাবুর দিকে চাইলাম। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবার স্পর্ধা ত বঙ্কুবাবুর হবার কথা নয়।

ঠাট্টা নিশ্চয় বঙ্কুবাবু করেন নি, কিন্তু তাঁকে সে বিষয়ে জেরা করার ফুরসত তখন আর হল না। হঠাৎ আমার একটা হাত সজোরে চেপে ধরে তিনি হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে যেখানে দাঁড় করালেন, সেটা আগেকার সেই বিদেশী খনি-সন্ধানীদের একটা প্রায় ধসে পড়া পোড়ো বাংলা। নেহাত তখনকার দিনের সরেস মশলায় মজবুত করে তৈরী বলে একেবারে ধূলিসাৎ হয় নি। ওপরের টালির ছাউনি নিয়ে থামসমেত একটা চওড়া বারান্দার খানিকটা অংশ এখনও খাড়া আছে।

সেই বারান্দারই একটা থামের আড়ালে দাঁড়াতে বাধ্য হয়ে হতভম্ব হয়ে চাপা গলাতেই জিজ্ঞাসা করলাম,—কি, হল কি হঠাৎ ?

কোন উত্তর না দিয়ে বঙ্কুবাবু অত্যন্ত সন্তর্পণে বকের মত পা বাড়িয়ে বারান্দার ধার থেকে একবার ঘুরে এলেন। তারপর সেই কাঁদুনে গলারই অদ্ভুত ফিসফিস সংস্করণ শুনিয়ে বললেন,—এখানেও এসেছে।

এখানেও এসেছে!—শুধু কথাটার নয় বঙ্কুবাবুর বলার ধরনেও আপনা থেকেই একটু শিউরে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম—কে এসেছে? নাগাপ্পা!

বঙ্কুবাবু করুণভাবে মাথা নাড়লেন।

আমাদের দেখতে পেয়েছে?—উদ্বেগের তীব্রতায় গলার স্বরটা চেপে রাখাই তখন শক্ত হয়ে উঠেছে।

না, তা বোধহয় পায় নি।—বঙ্কুবাবু কিছুটা আশ্বস্ত করে জানালেন যে নাগাপ্পা কোনো কাজ সেরে এঞ্জা পাহাড় থেকে ফিরে যাচ্ছে বলেই মনে হয়। সুতরাং কিছুক্ষণ এই পোড়ো বাংলোতে লুকিয়ে থাকতে পারলে তাকে এখনকার মত এড়ানো যেতে পারে।

বঙ্কুবাবুর যুক্তিটা না মেনে পারলাম না। বারান্দার এক কোণের ভেঙে পড়া একটা থামকে বেঞ্চি করে বসে প্রথম দুর্ভাবনার কথাটাই বঙ্কুবাবুকে জানালাম। বললাম—রাতটা ত এ পাহাড়েই কাটাতে হবে মনে হচ্ছে। লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে আজ ফেরবার কোন আশা বোধহয় নেই?

লোধমা পাহাড়ের ছাউনি!—বঙ্কুবাবু যেন আমার বিরুদ্ধে করুণ নালিশ জানালেন,—আপনি এখন ছাউনির কথা ভাবতে পারছেন! ক্যান্টিনের খাবার, ক্যাম্প খাটের মশারী দেওয়া বিছানা, পেট্রোম্যাক্সের আলোর জন্যে মন কেমন করছে বোধহয় আপনার। গোয়েন্দাগিরি করবেন অথচ গায়ে আঁচড়টি সহ্য করতে পারবেন না! এদিকে আমি, এই তিন দিন তিন রাত এই পাহাড়ে জঙ্গলে প্রাণ হাতে করে তাড়া-খাওয়া জন্তুর মত ওই জল্লাদ নাগাপ্পার···

বঙ্কুবাবু মনের দুঃখে আরো অনেক কিছু নিশ্চয় বলে যেতেন। একটু হেসে তাঁকে থামিয়ে বললাম, থামুন! থামুন! আরামের জন্যে নয়, ওই জল্লাদ শয়তান নাগাপ্পার শেষ ব্যবস্থা করবার জন্যেই লোধমার ছাউনিতে ফিরে যেতে চাইছি তাড়াতাড়ি।—নাগাপ্পার মরণ-কাঠি এখন আমার হাতের মুঠোয়।

খুব ত বাহাদুরী তখন থেকে শুনছি।—বঙ্কুবাবু এবার একটু তেতো গলাতেই বললেন—আমাকে ত একবার ছুঁতেই দিলেন না! কিন্তু ওই ছাই-পাঁশ ঘেঁটে মরণ-কাঠির মত সত্যি কি পেয়েছেন শুনি! ওই আরদালির পেতলের চাকতিটা, ওরই জোরে নাগাপ্পার গলায় ফাঁস টেনে দেবেন।

শুধু চাকতিটা নয় বঙ্কুবাবু।—এবার তাঁকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করলাম,—আমার কাছে সামান্য যা সব প্রমাণ এখন আছে তা আর কিছু না হোক নাগাপ্পাকে কাঠগড়ায় তুলে দায়রা সোপরদ্দ করবার পক্ষে যথেষ্ট। মামাবাবুর হাতে পড়লে এ সব জিনিস গলা ছেড়ে কথা কইবে!

তিনি যখন নেই তখন আপনিই একটু বুঝিয়ে দিন না।

বঙ্কুবাবুর অবিশ্বাসের সুরটাই মেজাজ গরম করে দিলে। অবজ্ঞার হাসিটা পুরোপুরি লুকোবার চেষ্টা না করেই বললাম,—বোঝালেই কি বুঝতে পারবেন। তবু শুনুন।

পকেট থেকে বোলতার চাকের মত জিনিসের ছবিটা বার করে দেখিয়ে বললাম,—এটা কিসের ছবি জানেন?

বঙ্কুবাবুর বিদ্যেবুদ্ধিকে অতটা তাচ্ছিল্য করা উচিত হয় নি। ছবিটাকে তিনি বোলতার চাক বললেন না। দু এক সেকেণ্ড, বেশ মন দিয়ে দেখে বললেন,—না জানার কি আছে। এ তো একরকম নুড়ি। এর ভেতর লোহাটোহা গোছের ধাতু পাওয়া যায়। পাহাড়ে জঙ্গলে এরকম নুড়ি আগেও দেখেছি।

দেখেছেন।—এবার বঙ্কুবাবুর ওপর একটু ভক্তি নিয়েই বললাম,—আপনার ত তাহলে দেখবার চোখ আছে। অবশ্য খনির কাজেই এতকাল কাটাবার পর নজর একটু তীক্ষ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক।

আমরা নিচু গলাতেই আলাপ করছিলাম। তবু তার মধ্যেই হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমায় চুপ করিয়ে বঙ্কুবাবু সাবধানে পোড়ো বাংলোর বাইরে একবার উঁকি দিয়ে এলেন।

কি আবার আসছে নাকি!—বঙ্কুবাবু ফিরে আসবার পর সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

না, তা আসছে না! বঙ্কুবাবু আশ্বস্ত করে বললেন,—তবে তাড়াতাড়ি এখান থেকে বার হওয়া ঠিক হবে না।

তাড়াতাড়ি বার হওয়ার জন্যে আমিও তখন ব্যস্ত নই। বঙ্কুবাবুকে ব্যাপারটা বোঝাবার উৎসাহই তখন বেশী।

আগের কথার খেই ধরে ছবিটা আর একবার দেখিয়ে বললাম, —এ ধরনের নুড়ি আপনি দেখেছেন বটে কিন্তু তার দাম যে কী হতে পারে কিছুই বোঝেন নি। এ জাতের নুড়ির পরিচয় আজই অবশ্য দুপুরে মামাবাবুর কাছে পেয়েছি। বোলতার চাকের মত এ নুড়ির নাম হ'ল পেরিডোটাইট। এর ভেতরে নিকেল ক্রোমিয়ম গোছের ধাতু ত বটেই সোনার সমান দামী প্ল্যাটিনম্‌ও পাওয়া যায়। জঙ্গলের লুকোন গর্তের মধ্যে আদিবাসী আরদালির পেতলের চাকতির সঙ্গে এই-আধপোড়া কাগজের ছবিটা আর টুকিটাকি লেখা পাওয়ার মানেটা এবার ধরতে পারছেন?

হতভম্ব নয়, এবার বেশ একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বঙ্কুবাবু ধীরে ধীরে বললেন—আপনি তাহলে সন্দেহ করছেন যে আদিবাসী আরদালিকে খুন করার আসল কারণ এই কাগজগুলো? সে এগুলো পেয়ে তার মনিব মহাস্তীকেই সম্ভবতঃ দেখাতে যাচ্ছিল। সেই দেখানোটা বন্ধ করবার জন্যে কেউ তাকে এই নির্জন পাহাড়ী রাস্তাতেই শেষ করে কাগজগুলো পুড়িয়ে দূরের ওই গর্তে পুঁতে রেখেছে!

ঠিক ধরেছেন!—বঙ্কুবাবুর বুদ্ধির তারিফ করে বললাম,—শুধু তাই নয়, ক্ষ্যাপা হাতীর কাজ বলে আদিবাসীর খুনটাকে একটা দৈব দুর্ঘটনার চেহারাও দিতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু আপনাদের নাগাপ্পা ত ওখান থেকে সত্যিই হাতীর বিষ্ঠা চেঁছে পেয়েছে!

বঙ্কুবাবুর কথাটায় বেশ একটু চমকে উঠলাম। শুধু বিচার বুদ্ধি নয় তাঁর স্মরণশক্তিরও পরিচয় পেয়ে। নাগাপ্পার হাতীর বিষ্ঠা পাওয়ার কথাটা আমি যে তাঁকে বলেছি তাই আমার মনে ছিল না।

খুশী হয়ে উৎসাহভরে বললাম,—খুব ভালো একটা পয়েন্ট ধরেছেন। কিন্তু ওই হাতীর বিষ্ঠা পাওয়াই নাগাপ্পার একটা কারসাজি। মহাবুয়াং-এর ক্ষ্যাপা হাতী এ অঞ্চলে সেদিন আসে নি বলে প্রমাণ পাবার পর, ব্যাপারটা নতুন করে ঘোরালো করবার জন্যে সে এই চাল চেলেছে বলে আমার বিশ্বাস। একটার জায়গায় আরেকটা ক্ষ্যাপা হাতীর এ পাহাড়ে এসে দৌরাত্ম্য করা অস্বাভাবিক হলেও একেবারে অসম্ভব ত নয় এই যুক্তিটাই সে কাজে লাগাতে চেয়েছে।

ব্যাপারটা তাহলে বেশ গুরুতর মনে হচ্ছে।—বেশী রকম গম্ভীর হওয়ার দরুন বঙ্কুবাবুর গলার কাঁদুনে ভাবও যেন অনেকটা কেটে গেছে, মনে হ'ল,—এ কাগজগুলো যার কাছে অত দামী সে এগুলো বাইরের কারুর হাতে না পড়তে দেওয়ার জন্যে একটার ওপর দুটো খুন নিশ্চয় করতে পারে। আপনার কাছে এখন এগুলো আছে জানতে পারলে আপনি যাতে আর লোধমা পাহাড়ে ফিরতে বা কারুর হাতে এসব দিতে না পারেন সে চেষ্টা কেউ করবে না মনে করেন?

বুকের ভেতরটা একটু কেঁপে উঠলেও মুখে সে ভয় ফুটতে না দিয়ে হেসে বললাম—জানলে নিশ্চয় করবে! কিন্তু জানতে ত এখনো পারে নি।

তাও জোর করে বলা যায় কি? বঙ্কুবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, —আমায় সে যখন গুলি করবার চেষ্টা করেছে, আর আপনি যে আমার সঙ্গে সেদিন ওখানে ছিলেন তা আপনার কাছেই জেনেছে, তখন দুই দুই-এ চার করে গর্তের জিনিস আমরাই হাতড়ে বার

করেছি বলে ধরে নেওয়া তার পক্ষে সহজ। আমরা দুজনই যখন তার চোখে দুশমন তখন বিপদের ঝুঁকিটাও ভাগাভাগি করে নেওয়া উচিত। তাই বলছি আপনার কাছে যা আছে তার কিছু অন্ততঃ আমাকে দিন। একজনের কিছু নেহাতই যদি হয় ত সমস্ত প্রমাণ খোয়া যাবে না।

আমায় একটু দ্বিধা করতে দেখেই বোধহয় বঙ্কুবাবু আবার বললেন,—আপনি না হয় চাকতিটা রাখুন, আমাকে কাগজগুলো দিন।

আমি কিন্তু ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছি। বিপদের ঝুঁকি যা নেবার একলাই নেব। অকারণে বঙ্কুবাবুকে তার মধ্যে জড়াব না। শক্ত হয়েই তাই বললাম,—না বঙ্কুবাবু। নেহাত আমার অনুরোধে পথ দেখাতে এসে এর মধ্যেই যা ভোগান্তি আপনার হয়েছে তার জন্যেই আমি লজ্জিত, দুঃখিত। আর বিপদে আপনাকে ফেলতে চাই না। কিন্তু এ কি!

চমকটা এবার ভয়ের নয়, বিস্ময়ের সঙ্গে খুশির। চারিদিকের অন্ধকার এতক্ষণে বেশ গাঢ় হয়ে এসেছিল। হঠাৎ সে অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠাতেই চমকে উঠেছিলাম। অবাক হয়েই হেসে বললাম,—সূর্য আবার উল্টো চলছে নাকি!

সূর্য উল্টো চলে নি। বঙ্কুবাবু সাবধানে একবার দেখে আসবার পর বাইরে বেরিয়ে দিনের আলো হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কারণটা বুঝতে পারলাম। প্রায় সারা আকাশ যে মেঘ ছেয়ে এসেছিল পশ্চিমের দিকে সেটা অনেকখানি ফাঁক হয়ে যাওয়ার দরুনই পড়ন্ত সূর্যের আলোও এতখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সে আলোয় এঞ্চা পাহাড়ের ওপরকার রূপ সত্যিই অপূর্ব আর আর পবিত্র বলে মনে হল। তারই মধ্যে দারুণ এক শয়তানীর খেলা যে চলছে তা বিশ্বাস করাই শক্ত।

কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাসে কুৎসিত সত্যকে ত আর ভুলে থাকা যায় না। তাই বঙ্কুবাবুকে একটু ব্যাকুলভাবেই জিজ্ঞাসা করতে হল, আলো যা হয়েছে তাতে লোধমা পাহাড়ে ফেরবার চেষ্টা করলে হয় না? মহান্তী আর মামাবাবুর কাছে এগুলো পৌঁছে দেওয়া সব চেয়ে এখন জরুরী তা বুঝছেন ত?

খুব বুঝছি!—বঙ্কুবাবু আমার বলার ধরনেই যেন একটু মজা পেয়ে বললেন,—কিন্তু তার চেয়ে জরুরী একটা কাজ আগে না সারলে নয়। নাগাপ্পার কেন আমার ওপর এত আক্রোশ এখা পাহাড়ে গিয়ে বোঝাবো বলেছিলাম। চলুন, এমন কিছু আপনাকে দেখাচ্ছি, যায় পর এখানকার কোনো রহস্য সম্বন্ধে আর আপনার জানবার কিছু থাকবে না বলে আমার বিশ্বাস।

বঙ্কুবাবুর মত মানুষের মুখে এ ধরনের আস্ফালন শুনে মনে মনে একটু হাসি যে পেয়েছিল তা অস্বীকার করব না। সেই সঙ্গে কিছুটা হতভম্বও হয়েছিলাম।

কোনও প্রশ্ন আর না করে তাই তিনি যা যা বলেছিলেন শুনেছি।

বঙ্কুবাবু একটা বনের পথ দেখিয়ে একা একাই আমায় এগিয়ে যেতে বলেছিলেন। পথটা যে পীক-ভিউ-এ শেষ হয়েছে তাও তিনি জানাতে ভোলেন নি। পীক-ভিউ এ গিয়ে তিনি আমায় খানিক অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে নাগাপ্পা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি আমার কাছে এসে যা দেখাবার দেখাবেন।

বৃষ্টি তখন আবার একটু ঝির ঝির করে পড়তে সুরু করেছে। আকাশের আলোও বেশ ম্লান হয়ে এসেছে। একা একা পীক-ভিউ-এ দাঁড়িয়ে একটু অস্বস্তিই লাগছিল। বঙ্কুবাবু এখান থেকে কি এমন দেখাতে পারেন বুঝে উঠতে পারছিলাম না। নিচের দূর সমতল পর্যন্ত প্রায় সোজা দেয়ালের মত যে ঢাল

নেমে গেছে তাতে কিছু দেখতে গেলে ত কোমরে দড়ি বেঁধে নামতে হয়।

কিছু পেলেন দেখতে ?

হঠাৎ বঙ্কুবাবুর মিহি কাঁদুনে গলায় চমকে উঠেছিলাম। তিনি কখন এসে পৌঁছেছেন টের পাই নি।

কি আবার দেখতে পাব ? একটু রুক্ষ হয়েই বলেছিলাম,—যা দেখলে এখানকার কোন রহস্য সম্বন্ধেই আর কিছু জানবার থাকবে না, তাই দেখাবেন ত বলেছিলেন। কই দেখান ?

তেরো

বঙ্কুবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন।

হঠাৎ আচমকা আমায় প্রচণ্ড এক ঠেলা দিয়ে বলেছিলেন,—দেখুন এবার!

আর কিছু যদি তিনি বলে থাকেন, শুনতে পাই নি। কারণ তখন আমি পা হড়কে সেই ভয়ঙ্কর খাড়াই বরাবর পড়তে পড়তে বৃথাই পাহাড়ী ঢালের গাছপালা লতাপাতা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছি।

কতক্ষণ বেহুঁশ হয়েছিলাম জানি না, কিন্তু প্রথম যখন চোখ খুলে তাকালাম তখন কি, কেন, কোথায় ঠিক মত স্মরণ করতেই বেশ একটু সময় গেল।

শরীরটার কোথায় কি হয়েছে বা সেটা এখনো আস্ত আছে কিনা তা বোঝবার ক্ষমতা তখন নেই। তার ওপর মাথাটাও বেশ একটু যেন গুলিয়ে গেছে।

মাথাটা একটু পরিষ্কার হতেই কোথায় আছি বোঝবার চেষ্টা করলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম না প্রথমটায়। লতাপাতার ভেতর দিয়ে সন্ধ্যের আকাশ একটু দেখা যাচ্ছে কিন্তু নিচে বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ একটা পাঁকাল-জঞ্জালের রাশের মধ্যে যেন আধ ডোবা অবস্থায় আছি।

যেটুকু সাড় ছিল তাতে ক্রমশঃ বুঝলাম শরীরটায় যা মাখামাখি হয়ে গেছে বিশ্রী দুর্গন্ধটা সেই নোংরা পাতলা গোছের কাদাটে জলের। জংলী লতাপাতা ডালপালা পচেই পাতলা নোংরা কাদাটা তৈরি হয়েছে। আর দুর্গন্ধ তার যত বিদঘুটেই হোক প্রাণটা যে আমার তাইতেই আপাততঃ বেঁচেছে তা বুঝতেও এবার দেরী হল না।

খাড়া পাহাড়ের তলার দিকে কোথাও একটা গভীর ডোবা বড় ইঁদারা গোছের গর্ত বর্ষার জল আর পাহাড়ী জঙ্গল থেকে খসে-পড়া ডালপালা লতাপাতা জমে পচা জঞ্জালের কুণ্ড গোছের হয়েছে। ওপর থেকে সবেগে গড়াতে গড়াতে সেই খাদের মধ্যে না পড়লে বোধহয় গুঁড়ো হয়ে যেতাম।

ওপর থেকে হঠাৎ আচমকা কেন পড়ে গিয়েছি সেটা মনে করতে গিয়ে আর একবার যেন শিউরে উঠলাম।

আর কেউ নয় স্বয়ং বঙ্কুবাবুই আমায় ঠেলে দিয়েছেন! তাঁর ঠেলে দেওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এ-রকম একটা ব্যাপার আমার কাছে কল্পনাতীত ছিল বললেও কম বলা হয়।

ব্যাপারটা এমন আজগুবী ও অবিশ্বাস্য যে এখনো তা নিয়ে ভাবতে গেলে দিশাহারা হতে হয়। তাঁর হাতের ঠেলা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোধমা পাহাড়ের ব্যাপারে যা কিছু এ পর্যন্ত বুঝেছি সব কিছুর মানে এক মুহূর্তে কতখানি যে বদলে গেছে, যত জরুরীই হোক সে বিচারের তখন কিন্তু আর সময় নেই।

পচা জঙ্গলের কুণ্ডটা কত গভীর জানি না, কিন্তু ক্রমশঃই তার মধ্যে একটু একটু করে যে ডুবছি সেটা টের পেয়ে বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে এল। অত উঁচু থেকে পড়েও প্রাণে বেঁচে গেছি বলে মনে যে আশাটুকু জেগেছিল তা আতঙ্ক হয়ে উঠল এবার। খাড়া পাহাড় থেকে পড়ে নিচে চুরমার হওয়ার বদলে এই পচা জঞ্জালের কুণ্ডে একটু একটু করে দম বন্ধ হয়ে ডুবে মরাই কি আমার নিয়তি? তা যে আরো ভয়ঙ্কর?

এর মধ্যেই পচা, আধ-পচা আর কাঁচা ও শুকনো লতাপাতার নোংরা জঞ্জালে আমার নাক মুখ পর্যন্ত চাপা পড়তে শুরু করেছে! মুখের ওপর থেকে সে-গুলো সারাবার চেষ্টা করতে গিয়ে এইটুকু শুধু দেখলাম যে হাত দুটো ক্ষত বিক্ষত হলেও একেবারে অকেজো হয় নি।

কিন্তু পঙ্গু না হলেও সে হাত দিয়ে করব কি। চিৎ অবস্থা থেকে কোন রকমে কাৎ হয়ে কুণ্ডটার ধারের দিকে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সভয়ে টের পেলাম যে প্রাণপণে হাত চালিয়েও এক চুল এগোবার বদলে ধীরে ধীরে আরো তলিয়ে যেতেই শুরু করছি। তরল পাতা কাদা আর লতাপাতার পচানির মধ্যে ধরবার ত কিছু নেই। আঁকু পাঁকু করে সাঁতারের মত হাত চালাতে গেলে নাড়া খাবার দরুনই নিচের জঞ্জাল দেহের ভারে আরো নেমে যায়।

কোন রকম নড়াচড়া না করে যতক্ষণ সম্ভব ওপরে ভেসে থাকবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু সুতরাং করবার নেই। শেষ পর্যন্ত তাতেও তলিয়ে যেতেই হবে। একটি মাত্র আশা এই যে সে পরিণামের আগে যদি কেউ দৈবাৎ এদিকে এসে আমাকে দেখতে পায়। আকুলভাবে কয়েকবার নিজের বিপদ জানাতে চীৎকার করলেও আমার সাহায্যে কারুর ছুটে আসা যে প্রায় অলৌকিক ব্যাপার মনে মনে তা অবশ্য বুঝতে তখন আমার বাকি নেই। এই পাহাড়ী অঞ্চলেই মানুষজনের চলাফেরা একান্ত বিরল। তার ওপর এই এঞ্চা পাহাড়ের তলায় ঠিক আমি যেখানে জংলা জঞ্জালের খদে ডুবে মরতে বসেছি সেখানে হঠাৎ কার বেড়াতে আসার দায় পড়বে।

শেষ যা হবে তার জন্যে মনটা তৈরি করবার চেষ্টাই করতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম।

অবিশ্বাস্য আশাতীত অলৌকিক ব্যাপারই সত্যি ঘটেছে। কিছু দূরে কটা পাথুরে ঢিবির পেছন থেকে দুটি মানুষ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে।

একজন নয় একেবারে দুজন মানুষ।

তাও আদিবাসীদের কেউ নয়। চেহারা পোশাকে রীতিমত সভ্য মানুষ বলেই বোঝা যাচ্ছে।

আরো কাছে আসার পর মানুষ দুজনকে চিনতেও অসুবিধা হল না।

এই কি শেষ পর্যন্ত আমার আশাতীত অলৌকিক সৌভাগ্যের ব্যাপার ?

আশায় উত্তেজনায় বুকের ধুকধুকানি যেমন বেড়ে গিয়েছিল তেমনি যেন হঠাৎ থেমে যাবার উপক্রম হল। কারণ প্রায় অলৌকিক ভাবে যাঁরা আমার এই সর্বনাশা বিপদের মুহূর্তে এসে দেখা দিয়েছেন তাঁদের একজন হলেন সরকার সাহেব, আর একজন বঙ্কুবাবু।

এঁদের দেখবার পরও মনের মধ্যে ক্ষীণতম আশা যদি জেগে থাকে দুজনের প্রথম কথাতেই তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এঁরা পাহাড়ী খদটার ধারে এসে দাঁড়াবার আগেই খানিকটা ভয়ে খানিকটা কি করব ঠিক করতে না পারার বিমূঢ়তায় আমি চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছিলাম।

খদের পাড় থেকে চোখবোজা অবস্থাতেই দুজনের আলাপ শুনতে পেলাম।

প্রথমেই সরকার সাহেবের গলা,—'শেষ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

'হওয়ারই কথা, তবে প্রাণটা একেবারে না গিয়ে থাকতে পারে। এখনো একটু ধুকধুকুনি হয়ত আছে।'

'তাহলে কি তোলবার চেষ্টা করবেন।'

'তোলবার চেষ্টা করবে! আহাম্মক ইডিয়ট! ওই খদের মধ্যে তোমারও কবরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

কথাগুলো যা শুনলাম তা বুক কাঁপিয়ে দেবার মত কিন্তু ওই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যেও বক্তা দুজনের ভূমিকার অদল বদল আমায় তখন বিস্ময় বিমূঢ় করে দিয়েছে।

চেহারা ত আগেই দেখেছি। দুজনের গলাও আমার নিতান্ত চেনা। প্রথমটা যে সরকার সাহেবের আর দ্বিতীয়টা বঙ্কুবাবুর এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশই নেই।

কিন্তু তাঁদের পরস্পরের সম্পর্কটা হঠাৎ এমন অদ্ভুত ভাবে পাল্টে গেল কি করে।

যাঁকে মনিব ও ওপরওয়ালা বলে জানি সেই সরকার সাহেবের গলা থেকে কথাবার্তার ধরন ত একেবারে বশম্বদ হাত-কচলানো গোলামের মত, আর বঙ্কুবাবুর ঠিক যেন জাঁদরেল জবরদস্ত মালিকের।

গলার স্বরটা সরু খনখনে ধরনের হলেও তাঁর আওয়াজই এখন আলাদা।

পোড়া কাগজপত্র লুকানো গর্তটা ঘাঁটবার সময় বঙ্কুবাবুর এই ধরনের গলার আভাস যে পেয়েছিলাম এতক্ষণে সেটা খেয়াল হল। বঙ্কুবাবু তখন সরকার সাহেবকে ধাঁতাচ্ছিলেন। দুর্বল উৎপীড়িত অসহায়ের মরিয়া বিক্ষোভের জ্বালা বলে যা মনে করেছিলাম তাতেই যে বঙ্কুবাবুর আসল চেহারার প্রকাশ তা তখন বুঝতে পারিনি।

বুঝলে অমন আহাম্মকের মত তাঁর শিকার হবার আগে একটু বোধহয় সাবধান হতে পারতাম।

দুজনের কথাবার্তা তারপর যা শুনেছি তাতে আমার শেষ ধুকধুকুনিটুকুও ওইখানেই খতম করে দেওয়া যে বঙ্কুবাবুর মতলব তা বুঝতে তখন বাকি থাকে নি।

সরকার সাহেব ভয়ে ভয়ে তখন শুধু জানিয়েছেন যে এদিকে লোকজনের যাতায়াত প্রায় না থাকলে খাদের জঞ্জালের ওপর আমার ভেসে থাকা লাশটা দৈবাৎ কারুর নজরে পড়েও যেতে পারে।

বঙ্কুবাবু তার উত্তরে ধমক দিয়ে বললেন—তাহলে একটা বড় ডাল খুঁজে নিয়ে এসো ইডিয়ট! খুঁচিয়ে ঠেলে, যেমন করে হোক ওর লাশটা খদের তলায় নামিয়ে দিতে হবে।

বুকের ভেতর একটা যেন বরফের চাঁই নিয়ে আমি তখন চোখ খুলে তাকিয়েছি।

বঙ্কুবাবুর ধমক খেয়েও সরকার সাহেব তখনো কিন্তু কেমন অসহায় কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

দাঁড়িয়ে আছ যে!—একটা অত্যন্ত কুৎসিৎ গাল দিয়ে বঙ্কুবাবু এবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন,—কি বললাম তোমাকে?

আজ্ঞে! সরকার সাহেব যেন ফাঁসির আসামীর মত কাঁপতে কাঁপতে বললেন,—ডাল আমি এখুনি আনছি। কিন্তু আমার একটা কথা যদি শোনেন!

কি কথা?—বঙ্কুবাবু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সরকার সাহেবের দিকে তাকালেন, চটপট বলে ফেলো। এখানে নষ্ট করবার মত আমার সময় নেই।

আজ্ঞে—অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সরকার সাহেব এবার বললেন—খুঁচিয়ে লাশটা খাদের তলায় নামিয়ে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু খাদটা খুব গভীর নয়। এ-দিকের আদিবাসী চাষীরা এ খাদ থেকে কখনো কখনো জমির সারের জন্যে পাতা পচানি নিয়ে যায় তা ত আপনিও জানেন। তাদের কেউ তলার লাশটা দেখে ফেলতে পারে।

যখন দেখবে তখন আমাদের পাচ্ছে কোথায়!

মুখে ধমক দিলেও বঙ্কুবাবুকে এবার একটু গুম হয়ে খানিক চুপ করে থাকতে দেখলাম।

তারপর কি ভেবে তিনি আমায় খাদ থেকে পাড়ে তোলার হুকুমই দিলেন।

যাও লম্বা ডাল একটা,—না, না, চোরা সুড়ঙ্গ থেকে রশিটাই নিয়ো এসো। সাড় যদি এখনো কিছু থাকে ত ছুঁড়লে দড়িটা ধরে নিতে হয়ত পারবে। তখন টেনে তোলা শক্ত হবে না। আর এর মধ্যেই যদি খতম হয়ে গিয়ে থাকে ত মাথা গলিয়ে ফাঁস লাগিয়ে টেনে তুলতে হবে।

বঙ্কুবাবুর এই বিস্তারিত নির্দেশ পেয়েও সরকার সাহেব যেন

অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে মরিয়া হয়ে বলে ফেললেন,—কিন্তু তারপর ?

আবার তারপর কিসের ? বঙ্কুবাবু যেন জল বিছুটির ঘা দেওয়ার মুখ ভঙ্গি করে বললেন,—মাথায় ষাঁড়ের গোবর নিয়ে এসেছ এ কারবার করতে ! মরা আধমরা যাই হোক এখান থেকে টেনে তুলে নিয়ে চোরা সুড়ঙ্গে ফেলে রাখব। আমরা হাওয়া হয়ে যাবার পর যুগ যুগান্তের মধ্যেও ও সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়ে ওর হাড় কখানা কেউ সেখানে খুঁজে বার করতে পারবে না। বুঝলে এবার গবেট ?

বুঝুন বা না বুঝুন সরকার সাহেব এবার বঙ্কুবাবুর হুকুম মানতেই চলে গেলেন। বঙ্কুবাবু একাই রইলেন খাদের পাড়ে পাহারায় দাঁড়িয়ে।

আমি চোখ খুলে তাঁকে দেখছি কি না বঙ্কুবাবুর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। লতাপাতা ডালপালায় আমার মুখটা তখন প্রায় ঢাকাই পড়ে গেছে। তা ছাড়া মরা না হোক বেহুঁশ আধমরা বলেই তখন আমায় ধরে নিয়ে বাতিলদের খাতায় তিনি নিশ্চয় আমার নাম তুলে দিয়েছেন।

আমি কিন্তু একাগ্র দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করতে করতে তখন তাঁর যথার্থ পরিচয়টা বোঝবার চেষ্টা করার সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় থাকা সম্ভব কি না তাই নিয়ে মনের মধ্যে তোলাপাড় করছি।

সরকার সাহেব আর বঙ্কুবাবু, দুই-এর জুটির মধ্যে, বঙ্কুবাবুই যে সর্বেসর্বা ও মাথা সেটা ত অনেক আগেই জলের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিজের পরিচয় লুকোবার জন্য সরকার সাহেবের অনেক অত্যাচার-সওয়া সামান্য বেয়ারা গোছের সেজে থাকাও তাঁর খুব বড় চালাকি সন্দেহ নেই।

মানুষটা শুধু প্যাঁচাল বুদ্ধিতেই শয়তান নয়, নিজের উদ্দেশ্য

সিদ্ধির ব্যাপারে পিশাচের মত যে নির্মম নিষ্ঠুর হাড়ে হাড়ে সে কথা বোঝবার পরও এত সব কাণ্ডকারখানার মূলে আসল উদ্দেশ্যটা তাঁর কি সে বিষয়ে একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায়। মামাবাবু যা অনুমান করেছেন তাই কি সব? সেই পেরিডোটাইট পাথরের ভেতরকার প্লাটি নাম-এর লোভ দিয়েই কি বঙ্কুবাবুর চরিত্র আর তাঁর জটিল সমস্ত শয়তানী কাণ্ডকারখানা ব্যাখ্যা করা যায়? মন কেমন যেন তা মানতে চায় না।

অথচ সেই মুহূর্তেই সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়াটা আমার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী, কারণ বঙ্কুবাবুর আসল উদ্দেশ্যটা না জানলে তাঁর হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোনো উপায় ভাবাই বুঝি সম্ভব হবে না।

এত কথা এমন গুছিয়ে সেই সময়টুকুর মধ্যে অবশ্য ভাবিনি। সামনে বঙ্কুবাবুকে খাড়া দেখে অস্থির মনের মধ্যে ঝড়ের বেগে চিন্তার স্রোত যেন বয়ে গেছে।

সরকার সাহেব বঙ্কুবাবুর হুকুমে কোথাও কোন চোরা সুড়ঙ্গ থেকে আমায় খাদ থেকে তোলবার জন্যে দড়ি আনতে গেছেন।

সেট আনবার পর কি কি হতে পারে তা একটু কল্পনা করবার চেষ্টা করছি। দড়ি এনে খাদ থেকে আমায় যেমন করে হোক ওঁরা টেনে তুলবেন। তারপর চোরা সুড়ঙ্গে আমায় নিয়ে গিয়ে ফেলবার কথা বঙ্কুবাবু জানিয়েই দিয়েছেন।

চোরা সুড়ঙ্গ বলতে কি বুঝায়, জায়গাটাই বা কোথায় কিছুই আমার জানা নেই। কিন্তু সেখানে নিয়ে গিয়ে ফেলা মানেই দুনিয়ার চোখের আড়াল করে দেওয়া এ কথা ত বঙ্কুবাবু জোর গলায় শুনিয়েছেন। এ জোর তিনি পাচ্ছেন কোথায়?

চোরা সুড়ঙ্গের সঙ্গেই কি বঙ্কুবাবুদের শয়তানী কাণ্ড কারখানার আসল রহস্য জড়িত? সেখানে গেলে আর কিছু না হোক সমস্ত দুর্বোধ ভয়ঙ্কর ব্যাপারের সঠিক ব্যাখ্যা কি পাওয়া যাবে?

তা যদি যায়, তাহলে চিরকালের মত মানুষের জগৎ থেকে

নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার বিপদ মাথায় নিয়েই সেখানে যাবার জন্যে আমি তখন উদ্‌গ্রীব।

সব শুদ্ধ মিলে কতখানি জখম আমি যে হয়েছি তখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, কিন্তু কি করে জানি না মনে এই বিশ্বাসটুকু জেগেছে যে একেবারে পঙ্গু যদি না হয়ে থাকি তাহলে বঙ্কুবাবুদের গোপন আসল ঘাঁটিতে একবার কোন রকমে ঢুকতে পারলে তাঁদের শয়তানির রহস্য-ভেদের সঙ্গে সেখান থেকে উদ্ধার পাবার একটা উপায়ও করতে পারব।

চোদ্দ

বঙ্কুবাবুদের আসল গোপন ঘাঁটি এঞ্জা পাহাড়ের চোরা সুড়ঙ্গে শেষ পর্যন্ত সত্যিই ঢুকতে পারলাম।

কিন্তু ওই ঢোকা পর্যন্তই সার। সেখানে একবার ঢুকতে পারলে বঙ্কুবাবুদের শয়তানি চক্রান্ত ভেদ করে উদ্ধার পাবার উপায় একটা বার করে ফেলতে পারব বলে যে অদ্ভুত ধারণা হয়েছিল সেটা নেহাত আশার ছলনা।

চোরা সুড়ঙ্গে ঢোকবার পরই নিজের যথার্থ অবস্থাটা বুঝতে পারলাম। কোন ফাঁক দিয়ে গলে পালাবার এতটুকু সুযোগ থাকলে বঙ্কুবাবুর মত পাকা শয়তান আমায় এখানে যে নিয়ে আসত না এ কথা অবশ্য আগেই বোঝা উচিত ছিল। এই চোরা সুড়ঙ্গে একবার ঢোকানো মানেই জীবন্ত কবর দেওয়া। বিশেষ করে আমার মত এই আধা পঙ্গু অবস্থায় বঙ্কুবাবু ও সরকার সাহেবের মত দুজন সুস্থ এবং নিশ্চয়ই সশস্ত্র জোয়ান মানুষের সঙ্গে যুঝে পালাবার কথা ভাবা যখন বাতুলতা।

যে খদের মধ্যে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিলাম তা থেকে উদ্ধার পাবার সময় চোরা সুড়ঙ্গের রহস্য জানবার আগ্রহ উত্তেজনাতেই বোধহয় মনে অমন অবুঝ আশা জেগেছিল। আশা এই যে, গায়ের জোরে না হলেও বুদ্ধির প্যাঁচে বঙ্কুবাবুদের ওপর হয়ত টেক্কা দিতে পারব। নিজেও বুদ্ধি সম্বন্ধে নেহাত আহাম্মকের মত এ গর্ব চুরমার হতে দেরি হয় নি।

সরকার সাহেব দড়ি নিয়ে আসবার পর সামান্য একটু নড়ে চড়ে একটু যেন সাড় ফেরবার ভান করেছিলাম। যেটুকু লক্ষ্য করে আমার গলায় ফাঁস লাগিয়ে টানবার চেষ্টা আর বঙ্কুবাবু করেন নি। দড়িটা আমার দিকে ছুড়ে দিয়েছিলেন শুধু।

এবার আর ভান করতে হয় নি। আপনা থেকেই ব্যাকুল হয়ে সেটা দু হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছিলাম।

বঙ্কুবাবু আর সরকার সাহেব সে দড়ি ধরে টেনে আমায় পাড়ে এনে তোলবার পর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যাওয়াটা অবশ্য বেশীর ভাগই অভিনয়। পাড়ে এসে পৌঁছোবার পর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়েই বুঝতে পেয়েছিলাম সর্বাঙ্গ বেশ একটু ক্ষত বিক্ষত হলেও হাড়গোড় কোথাও ভাঙ্গে নি। ইচ্ছে করলে দাঁড়াতে শুধু নয়—একটু কষ্ট করে হেঁটে যেতেও পারি।

বঙ্কুবাবুদের সেটা বুঝতে না দিলে পরে সুবিধে হতে পারে ভেবেই পঙ্গু হবার অভিনয় করেছিলাম। কিন্তু চালাকিটা একেবারেই সফল বোধহয় হয় নি। বঙ্কুবাবু কেমন একটু বাঁকা বিদ্রূপের সঙ্গে বলেছিলেন,—ছোটবাবুর পা দুটোর দফা রফা দেখছি যে! তবু সাবধানের মার নেই। চোরা সুড়ঙ্গে গিয়েই পা দুটোয় দড়ির একটা বাঁধন দিও। আপাততঃ টেনে হিঁচড়েই নিয়ে চল।

হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার কথায় মনে মনে ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু একবার পঙ্গু সেজে তারপর হঠাৎ খাড়া হয়ে ওঠা ত যায় না। বেশ কিছুক্ষণ কাৎরাতে কাৎরাতে অতি কষ্টে যেন খাড়া হবার চেষ্টার ভান তাই করতে হয়েছিল।

বঙ্কুবাবুকে তাতেও ফাঁকি দেওয়া যায় নি। বেশ একটু নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন, অত কষ্ট করে দাঁড়াবার দরকার নেই ছোটবাবু। পা আপনার খোঁড়া হলেও যা, মজবুত থাকলেও তাই। চোরা সুড়ঙ্গে ঢোকবার পর ও দুটো আর আস্ত রাখব না।

সরকার সাহেব তখন আমায় ধরে নিয়ে চলেছেন। তাঁর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেতে যেতে, কিছুই যেন বুঝতে পারছি না এমনি আচ্ছন্নের মত বঙ্কুবাবুর দিকে তাকিয়েছি। এ অভিনয়ও অবশ্য বৃথাই।

বুকের ভেতরটা তখন একেবারে হিম হয়ে গেছে। এই

শয়তানের সঙ্গে বুদ্ধির প্যাঁচে জেতবার কথা ভাবার স্পর্ধার জন্যেই নিজেকে তখন ধিক্কার দিচ্ছি। উদ্ধার পাবার কি বঙ্কুবাবুদের ধরিয়ে দেবার সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে চোরা সুড়ঙ্গের রহস্যটুকুই শুধু জেনে মরবার জন্যে মনকে তখন প্রস্তুত করেছি।

চোরা সুড়ঙ্গটা কোথায় আর কি রকম তা দেখবার পর সেখান থেকে মুক্তি পাবার আশা আপনা থেকেই মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল। নিজের চোখে না দেখলে ওরকম জায়গায় একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গের অস্তিত্ব কল্পনাই করতে পারতাম না।

যে খদের মধ্যে আমি পড়েছিলাম তা থেকে পাহাড়ী জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শ' খানেক গজ পায়ে চলার সরু আঁকাবাঁকা পথে যাবার পর আবার একটা পাহাড়ের ঢাল সামনে পড়ে। ওপরের চূড়া থেকে আমি প্রায় হাজার দুই ফুট নিচের খাদে পড়েছি। পাহাড়ের এ ঢালটা সেখান থেকে আরো প্রায় দু হাজার ফুট নিচের সমতলে গিয়ে শেষ হয়েছে! পাহাড়ের এ ঢালটার খাড়াই ওপরের তুলনায় কম নয় শুধু গাছপালা লতাপাতার জঙ্গল তাতে প্রায় নেই বললেই হয়। ওপরের খাঁজ থেকে তলার দিকে চাইলে হাত দশেক নিচে পাহাড়ের গায়ের একটা ফাটল চোখে পড়ে। তার ভেতর থেকে ক্ষীণ একটা জলের ধারা বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। বর্ষাকালে এ জলের তোড় বেড়ে বেশ জমকালো চেহারা-ই নিশ্চয় নেয়। এখন ধারাটা নেহাত সুতোলী। গ্রীষ্মকালে হয়ত শুকিয়েই যায় একেবারে।

এ দিকের জংলা পাহাড়ের গায়ে এ ধরনের ক্ষুদে ঝরনা একেবারে বিরল নয়। এ ঝরনার মুখের ফাটলটাও নেহাত ছোট। ওপরে নিচে পাথরের খোঁচ টোচ সমেত মোটামুটি ট্রেনের একটা জানলার মাপই হবে।

এই ফাটলটুকুই বঙ্কুবাবুদের গুপ্ত সুড়ঙ্গের দ্বার।

বঙ্কুবাবু আর সরকার সাহেব আমায় নিয়ে সেই ফাটলের ওপর

পাহাড়ের খাঁজে দাঁড়াবার পর নিচের দিকে চেয়ে দেখেও এ রকম একটা ব্যাপার সম্ভব বলে ভাবতেই পারি নি।

ওই ফাটল দিয়েই প্রায় সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে ভেতরে গিয়ে ঢোকবার পরও সত্যিই সেটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ বলে বিশ্বাস করা শক্ত হচ্ছিল। একবার এমন সন্দেহও হল যে চোরা সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ কিছু নয়, আমায় চিরকালের মত গুম করে রাখার এটা একটা সুবিধেমত জায়গা মাত্র।

কিন্তু আমার মত একটা অসহায় শিকারকে তাঁদের ধোঁকা দেবার দরকারই বা কি! আর তার জন্যে নিজেরাই বা অত কষ্ট তাঁরা করতে যাবেন কেন?

ও ফাটলের মুখে পৌঁছোতেই কম কসরৎ তো করতে হয় নি। ওপরের খাঁজ থেকে নিচের ঝরনার মুখ পর্যন্ত পাহাড়ী জংলা ডালপালা লতাপাতা জড়িয়ে এমন ভাবে বাঁধা যে সঠিক জানা না থাকলে তা দিয়ে লুকোনো সিঁড়ির কাজ যে হয় তা বোঝবার উপায় নেই। পাহাড়ের গায়ে জংলা লতাপাতার জট বলেই তা মনে হয়।

এই লুকোনো সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে নেমে গেছেন সরকার সাহেব। তারপর বঙ্কুবাবুর হুকুমে জখম শরীর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমায় নামতে হয়েছে। নিচে ঝরনার মুখে দাঁড়িয়ে সরকার সাহেব অবশ্য আমাকে ধরে নিয়ে সাহায্য করেছেন।

ঝরনার মুখটা যে কত ছোট জংলী লতার ঝুরি ধরে তার ধারে দাঁড়াবার পর বেশ ভালো করেই বোঝা গিয়েছে। সরকার সাহেব নিজেই প্রথমে সে ফাঁক দিয়ে বুকে হেঁটে ঢুকে না গেলে নিষ্ফল জেনে একটু প্রতিবাদের চেষ্টা বোধহয় করতাম।

প্রথমে সরকার সাহেব তারপর আমি আর শেষ বঙ্কুবাবু শ্যাওলায় পেছল ঝরনার খাতের নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে মিনিট দুয়েক একভাবে বুকে হেঁটে গিয়েছি। তারপরই সঙ্কীর্ণ ফাটলটা

নিচে ওপরে দুটো তলায় যেন ভাগ হয়ে গিয়েছে। জলের ধারাটা বেরিয়ে এসেছে নিচের ফাটল দিয়ে। তার ওপরের তাকটা কয়েক হাত পরেই হঠাৎ বেশ বড় সড় গুহা হয়ে উঠেছে।

বুকে হাঁটা ছেড়া মাথা তুলে এবার একটু দাঁড়াতে পারাটাই সৌভাগ্য মনে হয়েছে, সেই সঙ্গে চারিদিকে চেয়ে অবাকও হয়েছি।

জায়গাটা যে শুধু একটা গুহা নয়, কোন দীর্ঘ সুড়ঙ্গের একটা অংশ সামনের দিকে বহু দূরে অন্ধকারে তা মিলিয়ে যেতে দেখেই বোঝা গিয়েছে।

কিন্তু যেখানে উঠে দাঁড়িয়েছি সে জায়গাটাই যে অবিশ্বাস্য! পাহাড়ের বুকের ভেতর এরকম একটা লুকোনো ঘাঁটির কথা ভাবাই যায় না। হ্যারিকেনের আলো কাগজপত্রের ফাইল, নানা রকম পাথরের নমুনায় কাঁড়ি থেকে জলের ঘড়া, স্টোভ বেশ কিছু খাবারের টিন গোছের বহু জিনিস মজুদ।

পনেরো

কি বুঝছেন ছোটবাবু!

হঠাৎ বিদ্রূপের খোঁচারই উপযুক্ত বঙ্কুবাবুর ছুঁচোলো সরু গলার স্বরে চমকে উঠলাম।

তাঁর দিকে ফিরে তাকাতে বঙ্কুবাবু আবার ঘায়ের ওপর যেন নুনের ছিটে দিয়ে বললেন,—জায়গাটা পচ্ছন্দ হচ্ছে? এইখানেই আপনাকে থাকতে হবে কি না।

সব জেনেশুনেও ন্যাকা সেজে জিজ্ঞাসা করলাম—কতদিন?

অজ্ঞানের মত খদের ভেতর পড়ে থাকার সময় বঙ্কুবাবুদের প্রথম দিকের আলাপ যে আমি সব শুনেছি, তা তখন জানতে দিতে চাই নি।

বঙ্কুবাবু কিন্তু লুকোচুরির ধার দিয়েও গেলেন না। বেশ স্পষ্ট করেই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সুরে জানিয়ে দিলেন—কতদিন আর থাকবেন! ওই টিনের খাবারগুলো আর কলসির জলটা দিয়ে যতদিন চালাতে পারেন! তারপর আপনার হাড় কখানা অবশ্য যুগযুগান্তর এখানেই পড়ে থাকবে।

তার মানে,—স্থির ধীরভাবে কোনরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনারা আমায় এখানে ফেলে চলে যাবেন!

সেই রকমই ত ইচ্ছে! বঙ্কুবাবু হেসে উঠলেন খনখনে মিহি গলায়। শুধু ফেলে যাব না, যাবার আগে যে মুখ দিয়ে ঢুকেছি। সেটা একটি ডিনামাইটের কাঠি ফাটিয়ে চিরকালের মত ধ্বসে পড়া পাথরে বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করে যাব।

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলেও বাইরে সেটা যথাসাধ্য গোপন

করে যেন সহজ আলাপের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু আপনারা তাহলে যাবেন কি করে?

আমরা? —বঙ্কুবাবুর মুখে শয়তানী দম্ভের হাসি ফুটে উঠল, —আমাদের জন্যে মিছে ভাবনা করবেন না। আমরা এই সুড়ঙ্গের অন্য মুখের এমন গুপ্ত পথ দিয়ে যাব এখনো পর্যন্ত কারুর যা জানা নেই। আমরা চলে যাবার পর সে পথ খুঁজে বার করার মিথ্যে কষ্ট আপনাকে করতে হবে না। যাবার আগে আপনার পা দুটো সত্যিই খোঁড়া করে দিয়ে যাব।

নিরুপায় রাগে বুকের ভেতরটা তখন জ্বলছে। তবু মুখে একটু অবজ্ঞার হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললাম,—আমায় এই চোরা সুড়ঙ্গে কবর দিয়ে গেলেই কি আপনাদের কাজ হাসিল হবে আশা করেন!

তা করি বই কি! বঙ্কুবাবু তাঁর পেটেন্ট গলায় হেসে বললেন, আপনি এখানে নিপাত্তা হয়ে থাকলে আমাদের কাজ হাসিলের আর বাধা কোথায়। আপনি অবশ্য নিজের আহাম্মকিতেই নিজেই নিজের এ সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। গোয়েন্দাগিরির বাহাদুরিতে গর্তটর্ত ঘেঁটে ও সব গোলমেলে জিনিস যদি না খুঁজে বার করতেন তাহলে আপনাকে এমন করে জ্যান্ত কবর দিয়ে যেতে হত না। এখন ও সব বাহাদুরীর আবিষ্কার আপনার সঙ্গে এই সুড়ঙ্গেই পচবে। কেউ কোনদিন আর খোঁজ পাবে না। আমাদের পথও একেবারে পরিষ্কার।

উদ্ধারের কোন আশাই যখন নেই তখন বঙ্কুবাবুদের আর ভয় করবার কি আছে। মরিয়া হয়ে তাই বেপরোয়া বিদ্রূপের সঙ্গে বললাম,—স্বপ্নটা একটু বেশী রঙিন দেখছেন না কি বঙ্কুবাবু? আমাকে এখানে কবর দিলেই আপনাদের রাস্তা সাফ হবে না। ভুলে যাচ্ছেন কেন যে আপনাদের ওই পেরিডোটাইট নুড়ির রহস্য আমার মামাবাবুর কাছে আর লুকোনো নেই।

আপনার মামাবাবু! গা রী গী করে তোলা তাচ্ছিল্যের হাসির সঙ্গে বঙ্কুবাবু বললেন,—আপনার মামাবাবু পেরিডোটাইট পাথরের রহস্য ধরে ফেলেছেন? তাহলে শুনুন ছোটবাবু। যা এবার বলব, তাতে এই চোরা সুড়ঙ্গে প্রাণটা বেরুতে যে কটা দিন লাগবে সেই সময়টা মনে মনে জাবর কাটার অন্ততঃ একটা কিছু পাবেন। আপনার কাছ থেকে দুকান হবার আর যখন ভয় নেই তখন সার সত্যটা আপনাকে অনায়াসে জানিয়ে দিতে পারি। প্রথমতঃ আপনি নিজে একটি পয়লা নম্বরের উজুবক আর আপনার মামাবাবু তার চেয়ে এক কাঠি কম।

কথা বলতে বলতে সরকার সাহেব ও বঙ্কুবাবু দুজনেই এ গুহা ছেড়ে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। বেশ লম্বা হাঁটা পথের পাড়ি যে তাঁদের দিতে হবে আধা মিলিটারী সাজ পোশাক আর পিঠে বাঁধা হ্যাভারস্যাক বাঁধার ধরন থেকেই তা বুঝতে পারছিলাম। সাজগোজ প্রায় শেষ করে এবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বঙ্কুবাবু বেশ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শেষ কথাগুলো শোনালেন।

হ্যাঁ, সত্যিই উজবুক! পেরিডোটাইট পাথরের মর্ম আপনার মামাবাবু ঘণ্টা বুঝেছেন। বোলতা চাকের মত ওই পাথরের ডেলার ভেতর ক্রোমিয়ম আর প্ল্যাটিনাম ধাতু পাওয়া যায় ঠিকই। আপনার মামাবাবুকে এটুকুও নিজের চেষ্টায় জানতে হয় নি। তথ্যটা আমি-ই জুগিয়েছিলাম। নজরটা যাতে ওর বেশী না যায় তার জন্যে নাগাপ্পার প্যাডের কাগজে তার হাতের লেখার সঙ্গে নকল রেখে ইশারা দেবার মত কিছু টুকে ছেঁড়া কাগজের দলার মত পাকিয়ে সরকারের কাছে দিয়ে রেখেছিলাম। আসলে আরেক আহাম্মক হলেও সরকার ঠিক সময়েই কাগজের দলাগুলো কাজে লাগিয়েছিল। কাগজের দলা দিয়ে এক ঢিলে দু পাখী মারা হয়েছে। এক, বিলেতের মেটাল বুলেটিন-এর ছিটে ফোঁটা বাজার দর তুলে দেবার দরুন পেরিডোটাইট-এর খাস রহস্য থেকে দৃষ্টিটা ঘুরে

গিয়েছে, আর দ্বিতীয়তঃ লোধমা অঞ্চলের সব ব্যাপারে গোপনে খবরদারী করবার জন্যে ছদ্ম পরিচয়ে যাকে আনিয়ে রাখা হয়েছে সন্দেহটা ফেলা হয়েছে সেই গোয়েন্দা বাহাদুরের ওপর।

তার মানে? এই অবস্থাতেও মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল,—নাগাপ্পা গোয়েন্দা!

হ্যাঁ ছোটবাবু!—নিজের বাহাদুরী শোনাবার নেশা বঙ্কুবাবুর এবার ধরেছে মনে হল—এই ধড়িবাজ গোয়েন্দাটাকে শেষ করবার জন্যেই দুদিন দুরাত্রি এই পাহাড় জঙ্গলে লুকিয়ে ওত পেতে ছিলাম। আদিবাসী পিয়নটা কি ভাবে কে জানে এ গুপ্ত সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়ে এখানে ঢুকেছিল। আসল ব্যাপার কিছু না বুঝলেও কাগজপত্রের ফাইল দেখে অবাক হয়ে সে মহান্তীর কাছে যাচ্ছিল সেগুলো দেখাতে। খুব সময় মত তাকে খতম করেছিলাম। নাগাপ্পার বন্ধু, ওই হতভাগা সাহেব শিকারীটা আচমকা উদয় হয়ে বেয়াড়া খবরটা ফাঁস না করে দিলে ক্ষ্যাপা হাতীর নামেই ব্যাপারটা চালিয়ে দেওয়া যেত। নাগাপ্পা এ সব পাহাড় জঙ্গল চষে ফেলেও আর কোনো হদিস তাহলে পেত না। সাহেব বন্ধুর কাছে মহাবুয়াং-এর ক্ষ্যাপা হাতীর খাঁটি খবর পেয়ে নাগাপ্পা সন্দিগ্ধ হয়ে নতুন করে তল্লাসী শুরু করে, আর তাইতেই আমাদের আসল ধান্দাটার কিছুটা আঁচ পেয়েছে বলে আমার ধারণা। নাগাপ্পাকেই আগে খতম করা তাই খুব দরকার ছিল। কিন্তু তার বদলে নিয়তি আপনাকেই টেনেছে। নাগাপ্পার হিসেবটা না চুকিয়েই তাই চলে যেতে হচ্ছে। তাতে অবশ্য এমন কিছু ক্ষতি নেই। আমাদের আসল যা কাজ তা আমরা গুছিয়ে নিয়েই যাচ্ছি।

বঙ্কুবাবু যতক্ষণ তাঁর আস্ফালন শুনিয়েছেন, তার মধ্যে মাথার ভেতর আকাশপাতাল ভয়-ভাবনার মধ্যে শেষ একটা চাল আমি ভেবে নিয়েছি।

বঙ্কুবাবু থামতেই যথাসম্ভব টিটকিরির সুর গলায় ফুটিয়ে বললাম,

—গুছিয়ে নিলেও এখান থেকে যাওয়া আর আপনাদের বোধহয় ভাগ্যে নেই। খদের মধ্যে পড়বার পর আপনারাই প্রথম আমায় দেখেন নি। তার আগে মামাবাবু এসে আমার সঙ্গে কথা বলে গেছেন। তাঁর পরামর্শেই পঙ্গু সেজে আপনাদের অপেক্ষায় পড়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন আপনাদের এ চোরা সুড়ঙ্গ মামাবাবুদের আর অজানা নয়। এতক্ষণে তাঁরা চুপ করে নিশ্চয় বসে নেই। সুতরাং এখন আর তাঁদের হাত থেকে ছাড়া পাবার আশা করেন কি?

বঙ্কুবাবু যে রকম একটা অদ্ভুত মুখ করে আমার কথাগুলো শুনলেন, তাতে তাঁর মনে একটু ভয় ধরাতে পেরেছি বলে আশা হচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর ছুঁচলো গলার বিদঘুটে হাসিতে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হল। হতাশার আশা আমার শেষ প্যাঁচটা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে।

বঙ্কুবাবু হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের হুলটা দ্বিগুণ ছুঁচোলো করে ফুটিয়ে বললেন,—আপনার মামাবাবু চোরা সুড়ঙ্গটা জেনে ফেলে তৈরী হয়ে আছেন? তাহলে তো সর্বনাশ! এক মুহূর্ত আর দেরী করবার সময় নেই। যাও সরকার, ঝরনার মুখে ডিনামাইটের কাঠিগুলো ঠিক মত সাজিয়ে এসো। লোহার ডাণ্ডাটাও দাও। ছোটবাবুর পা দুটো ভেঙে দিয়ে যেতে হবে ত! আর সেই আসল থলিটাই শেষে ভুলে না যাই!

এই পর্যন্ত বলে বঙ্কুবাবু থামলেন। তারপর চোরা সুড়ঙ্গের একটা কোণ থেকে কটা পাথর সরিয়ে সত্যিই একটা ছোট চামড়ার থলে বার করে এনে আমার সামনে নেড়ে বললেন, কিছু বুঝতে পারছেন ছোটবাবু?

সত্যিই কিছু না বুঝে আমি চুপ করেই রইলাম। বঙ্কুবাবু নিজেই আবার বললেন,—এ থলির ভেতর কি আছে তা দেখলে আপনার ত বটে-ই আপনার মামাবাবুর চোখও চড়কগাছ হবে।

বঙ্কুবাবুর মুখের ভাব ও গলার স্বর দুই-ই তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যেন চাবুক মেরে শিক্ষা দেবার ভঙ্গিতে তিনি বলে গেলেন, হ্যাঁ, ছোটবাবু আপনার ধুরন্ধর মামাবাবু ওই বোলতার চাকের মত পাথর থেকে ক্রোমিয়ম আর বড় জোর প্ল্যাটিনম-এর বেশী কিছু পাবার কথা ভাবতে পারেন নি।

পেরিডোটাইটে কিন্তু শুধু ক্রোমিয়ম প্ল্যাটিনাম নয় ম্যাগ্নেটাইট অলিভিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়। আর সব চেয়ে আশ্চর্য যা পাওয়া যায় তা হল হীরে। দক্ষিণ আফ্রিকার হীরের খনির অঞ্চল থেকেই

পেরিডোটাইটের আর এক নাম হয়েছে কিম্বার লাইট। এই নামের প্রথম অক্ষর Kটা পুড়ে যাওয়াতেই গর্ত থেকে বার করা কাগজে imberlite শব্দটা আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে। এই হীরে সমেত পেরিডোটাইট সব জায়গায় পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় খুব বেশী, আমেরিকার আরাকানসাসে আর পাওয়া যায় আমাদের ভারতবর্ষে। এঞ্চা পাহাড়ের এই চোরা সুড়ঙ্গের ভেতরে এ পাথরের একটা শিরা আছে। উঁচু দরের হীরে খুব বেশী সে শিরায় না থাকলেও যা আছে তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আপাতত যতগুলো সম্ভব যোগাড় করে এই থলিতে নিয়ে যাচ্ছি। ইউরোপ আমেরিকার হীরের চোরাবাজারে এগুলো বেচে যা পাওয়া যাবে তা বড় কম নয়। সে টাকার কাঁড়ি দুদিনে উড়িয়ে দিয়েও আবার এখানে আসবার পথ আমাদের খোলা। গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথ শুধু আমাদেরই জানা। তা দিয়ে কখন আসব যাব কেউ জানতেও পারবে না।

আপনার মনে কি হচ্ছে তা বুঝতে পারছি ছোটবাবু। এত কথা জেনেও নিজের পোড়া বরাত আর বুদ্ধির দোষে এখানে খাঁচা কলে বন্দী ইঁদুরের মত পচে মরবেন। এত দুঃখের মধ্যে একটু সান্ত্বনার জন্যে হীরেগুলোর চেহারা একবার দেখে একটু চক্ষু সার্থক করুন।

চামড়ার থলে খুলে হীরে বার করতে গিয়ে বঙ্কুবাবুরই কিন্তু চক্ষুস্থির।

থলে থেকে দু একটা যা তিনি বার করেছেন তা আমিও তখন দেখতে পেয়েছি।

হীরে কোথায়! সেগুলো ত নুড়ি পাথরের টুকরো।

বঙ্কুবাবুর কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখে আর্তনাদের সঙ্গে রাগের গর্জন মেশানো একটা আওয়াজ বার হয়ে এল—কে? কে এ কাজ করেছে!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর গলার স্বরে সমস্ত সুড়ঙ্গও যেন গম,গম করে উঠল,—করেছি আমি। এঞ্চা পাহাড়ের পবিত্রতা যে নষ্ট করেছে তার কোন ক্ষমা নেই, নিস্তারও সে পাবে না।

হতভম্ব হয়ে আমার হাত পা তখন সত্যি অবশ হয়ে আসছে। সরকার সাহেবের অবস্থাও তথৈবচ।

বঙ্কুবাবু শুধু আরো কড়া ধাতুতে তৈরী। এই বিহ্বলতার মধ্যেও এক মুহূর্তে পকেট থেকে পিস্তল বার করে তিনি শব্দের উৎস লক্ষ্য করে সুড়ঙ্গের অন্য মুখে বার বার গুলি ছুড়লেন।

তাতে অপ্রত্যাশিত ফলই কিন্তু ফলল। গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরঙ্গ গুহায় আমাদের কাছেই ঝলক দিয়ে একটা বিদ্যুৎ শিখাই যেন জ্বলে উঠল সেই সঙ্গে আবার এক ঘোষণা।

গুলি ছুড়ে কোন লাভ নেই বঙ্কুবিহারী। এ পাহাড়ের নাম করালী তা ভুলো না। তোমার সব খেল এবার খতম। বুঝতেই পারছ তোমার এ চোরা সুড়ঙ্গ এখন সম্পূর্ণভাবে আমাদের দখলে। তোমার পালাবার কোন পথই আমরা রাখি নি।

ঘোষণার বক্তব্যের চেয়ে গলার স্বরে আমি তখন বিমূঢ় বিহ্বল। এবার গলা ত স্পষ্ট মামাবাবুর।

আমার মিথ্যে কল্পনাই তাহলে সত্য হয়ে উঠল?

হল সত্যিই তাই মামাবাবুই মহান্তী আর নাগাপ্পাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্কুবাবু আর সরকার সাহেবকে ওই চোরা সুড়ঙ্গের ভেতরেই ধরলেন।

বঙ্কুবাবু পালের গোদা বলে গোড়ায় সন্দেহ না করলেও এই চোরা সুড়ঙ্গের পেরিডোটাইটের রহস্য ভেদ করে মামাবাবু গোপনে অনেক দিন থেকেই তৈরি হচ্ছিলেন। আমিই আহাম্মকের মত তাকে ভুল বুঝেছি।

সমাপ্ত